দ্বি তী য় অ ধ্যা য়

মান্য বা শিষ্ট তথা নাগরিক সাহিত্য-সংস্কৃতির উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তন

বঙ্গদেশে মান্য বা শিষ্ট জীবন এবং সাহিত্যের একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বহমান ছিল। সেই শিষ্ট সামাজিক জীবনের অভিজাত পরিবেশেই চর্চিত হত সেকালের মান্য নাগরিক সাহিত্য এবং সংস্কৃতি। অতীতের সেই স্মৃতি রক্ষিত আছে কালের করাল স্রোতজয়ী কাব্য-সাহিত্যের অন্তরে। তবে বাংলার অতীত নাগরিক সংস্কৃতির ইতিহাস সন্ধান করতে গেলে দেখা যায় সেখানে অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবন-ছবি যেভাবে রক্ষিত, তুলনায় সাধারণ মানুষের লৌকিক জীবন-ছবি কিছুটা ছায়াচ্ছন্ন। কিছুটা বিক্ষিপ্তও বটে। যেসব পুরোনো ঐতিহাসিক শহরের নাম পাওয়া যায়---তাম্রলিপ্ত, কর্ণসুবর্ণ, সপ্তগ্রাম, পুণ্ড্রনগর, সুবর্ণগ্রাম--তাদের সাংস্কৃতিক সৃষ্টিকর্মের হদিশ বড় একটা মেলে না। কিছু পোড়ামাটির মূর্তি, মন্দির, বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ, পাথরের ভাস্কর্যের টুকরো, শিলালিপি এই জাতীয় নমুনা ছাড়া বিশেষ কিছুই টিকে নেই। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষেরা কেমনভাবে জীবনযাপন করত, কি ধরনের আমোদপ্রমোদ করত, তার সাহিত্যিক দলিল পাওয়া দুষ্কর। অবশ্য আগেই উল্লিখিত হয়েছে ওই যুগের বাঙালি নাগরিক অভিজাতবর্গের জীবনযাত্রার ও অবসর বিনোদনের চমৎকার বিবরণী পাওয়া যায়। বাঙালি নাগরিক সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে বেরিয়ে এমনটাই জানিয়েছেন গবেষক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ)।[১] বাৎস্যায়নের কামসূত্র, কলহনের রাজতরঙ্গিণী ইত্যাদি গ্রন্থে তার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। বাংলার অতীত নাগরিক সংস্কৃতির ইতিহাসের সন্ধান করতে গেলে আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজসভা-সাহিত্যের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। ঠিক তেমনই, প্রাগাধুনিক সাহিত্যের ইতিহাস মূলত রাজন্যবর্গ ও অভিজাত সমাজের জীবন এবং যাপনের ইতিহাস, পাশাপাশি তাদের পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাস। সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য সর্বক্ষেত্রে তখন মূলত রাজ আনুকূল্যের যুগ। 'The Sociology of Literary Taste' গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 'The Sociological Medium of Literatute in the Past'-এ Levin Ludwig Schucking প্রাগাধুনিক সাহিত্যে রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে বলেছেন :

> '...the history of literature is in large part the history of the beneficene of individual princes and aristocrats...In the Middle Ages much of the principal art kept entirely within the general

outlook of the bread-giver... . The world is seen through the spectacles of the feudal lord.'[২]

এই পর্যবেক্ষণ অনুসারে আমরা বলতে পারি যে 'ফিউডাল লর্ড' বা সামন্ত প্রভুদের পৃষ্ঠপোষকতায় পালিত সাহিত্যই মূলত রাজসভার সাহিত্য। এ সাহিত্যে স্বভাবতই স্রষ্টার নিজস্ব রুচি, সংস্কার, ব্যক্তিত্ব প্রকাশের বিশেষ সুযোগ থাকত না, বরং রচয়িতার পৃষ্ঠপোষকের রুচিই অনিবার্যভাবে রচনায় প্রকাশ পেত।

প্র থ ম প রি চ্ছে দ

অতীতের শিষ্ট নাগরিক সাহিত্য

প্রাচীনকাল থেকে মূলত রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায়, রাজসভা-কেন্দ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থায় যে প্রসাধিত মার্জিত সাহিত্য-সম্ভার গড়ে উঠেছিল তাই আমাদের নাগরিক সাহিত্যের পাথুরে প্রমাণ হিসেবে রয়ে গেছে। প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ) একবার বলেছিলেন প্রাচীন ভারতবর্ষের নাগরিক সভ্যতার 'শুধু আত্মার নয়, দেহের সন্ধানটাও আমাদের নেওয়া কর্তব্য, নচেৎ তার স্বরূপের সাক্ষাৎ আমরা পাব না। সেকালের নাগরিকদের মতিগতি রীতিনীতির আদ্যোপান্ত বিবরণ পাওয়া যায় কামসূত্রে। এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল অন্তত দেড়হাজার বৎসর পূর্বে, এবং এ গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছেন ন্যায়দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার স্বয়ং বাৎস্যায়ন; অতএব কামসূত্রের বর্ণনা আমরা সত্য বলেই গ্রাহ্য করতে বাধ্য, বিশেষত ও সূত্র যখন সংস্কৃত সাহিত্যে শাস্ত্র হিসেবেই চিরকাল গণ্য ও মান্য হয়ে এসেছে।'[৩] এ প্রসঙ্গে অবশ্য বলে রাখা প্রয়োজন এখানে নাগরিক বলতে কেবল 'man about town'[৪] বোঝাচ্ছে না, এখানে নাগরিক বলতে বিদগ্ধ বোঝাচ্ছে। এই বিদগ্ধ জনমণ্ডলীর, অভিজাত জীবনের 'রসনারোচন রসিক বিলাস' রূপে সাহিত্যচর্চার একটি বড় জায়গা ছিল। 'বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব'[৫] থেকে জানা যাচ্ছে সেকালে ধনী অভিজাতরা নৃত্য-গীতে, পান-ভোজনে, বিলাস-ব্যসনে, কাম-কলায়, বারাঙ্গনা-বিহারে কালযাপন করছে। এ জীবনের সাহিত্যিক প্রতিফলনই আমরা মূলত রাজসভা সাহিত্যে দেখতে পাই। রাজসভায় কবি-পোষণ ছিল আভিজাত্যের পরিচয়বাহী। যেসব শাসক স্বয়ং কাব্যরসিক ছিলেন তাঁরা সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের সংগ্রহ করে অবসর মতো কাব্যচর্চা করতেন। তা ছিল বিনোদনের এক অন্যতম মাধ্যম। শুধু তাই নয়, রাজাদের বীর-গাথা ও কীর্তিকাহিনী রচনার জন্যও বৃত্তি দিয়ে কবি-পালন করা হত। 'জনসভার সাহিত্য' গ্রন্থে বিনয় ঘোষ (১৯১৭-১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ) প্রাচীন যুগের ইউরোপে ও ভারতে রাজসভার কবিদের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করে বলেছেন

যে ইউরোপে টিউটন যুগের সভাকবি বা দরবারি গায়কদের বলা হত scop। এঁরা রাজাদের গুণগান করতেন এবং সভাস্থলে আবৃত্তি করে তাঁদের কীর্তিকলাপ বর্ণনা করতেন। এঁরা ছিলেন রাজার বৃত্তিভোগী এবং রাজসভায় এঁদের বিশেষ মর্যাদা ছিল।[৬] বৈদিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষেও এই প্রকারের রাজবৃত্তিভোগী স্তুতিগায়ক ও কবিদের সন্ধান পাওয়া যায় বলে দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন। তিনি জানাচ্ছেন এদেশে এই কবি-গায়কদের বলা হত 'সূত'। তিনি আরও বলছেন :

> '...ঋগ্‌বেদের সাক্ষ্যে জানা যায়, সাধারণত এদেশে সূতরা রাজাদের বীরগাথা ও কীর্তিকাহিনী গান করতেন।...মহাভারতের যুগে সভাকবিদের মধ্যে পেশা ও জাত অনুযায়ী স্বতন্ত্র শ্রেণি গড়ে উঠেছিল। মহাভারতে আছে যে ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয় সন্তান 'সূত' বলে পরিচিত হবে এবং তার পেশা হবে রাজা ও মহাপুরুষদের কীর্তিগাথা গান করা।'[৭]

সুতরাং সভাকবি ও সভা-কাব্যের একটা প্রাচীন ঐতিহ্য আদিযুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। আর যা কিছু 'রুটি ও রুচির কর্তা' রাজার অনুগ্রহ-পুষ্ট তাই যে অভিজাত সমাজে ক্রমশ মান্যতা পাবে তাতে আর দ্বিমত কোথায়! সাধারণ মানুষকে নিয়ে সাহিত্য বা কাব্যচর্চা রাজসভায় কোনোকালেই বিশেষ আমল পায় না। তাই সাধারণ জীবনের সাহিত্যিক দলিল তুলনায় অপ্রতুল। বরং মান্য, শিষ্ট, অভিজাতবর্গের জীবনধারার পথ বেয়ে প্রাচীন নাগরিক সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যায়।

আমাদের মনে রাখতে হবে রাজসভায় স্থান লাভ এবং রাজপারিতোষিক লাভের অন্যতম উপায় ছিল রাজস্তুতি এবং রাজমনোরঞ্জন। যুগে যুগে অধিকাংশ সভা-কাব্যে তাই রাজস্তুতির আড়ম্বর লক্ষিত হয়। রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ী তাঁর 'পবনদূত' কাব্যটি রচনা করে রাজার কাছ থেকে 'কবিরাজ' উপাধি, সোনা বাঁধানো চামরদণ্ড, হস্তী ইত্যাদি উপহার পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। এ কাব্যে তিনি স্বয়ং রাজা লক্ষ্মণসেনকে নায়ক করে তাঁর প্রতি কুবলয়বতী নাম্নী এক কাল্পনিক রাজকন্যার বিরহ-নিবেদন বর্ণনা করেছিলেন। রাজা তৃপ্ত হয়েছিলেন, ফলে কবিরও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছিল। সুতরাং এ কাব্যে রাজস্তুতির গূঢ় অভিপ্রায়কে অস্বীকার করা যায়না।

দীর্ঘ রাজসভা-সাহিত্যের ধারা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এই জাতীয় কাব্যে প্রাধান্য পেত দেবস্তুতি, রাজস্তুতি, নাগরিক প্রেম বা শৃঙ্গারচর্চা, যুদ্ধবর্ণনা ইত্যাদি। কাব্যের বিষয়বস্তু ও প্রধান চরিত্রসমূহ অভিজাত জীবন ও সমাজকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠত। সর্বোপরি এঁদের রচনায় প্রাধান্য পেত আদিরস। তাছাড়া বিদগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করতে হত বলে তাঁদের কাব্যকেও হতে হত মার্জিত, প্রযত্নসাধিত। অলঙ্কার

প্রাচুর্যে, সুনিপুণ মণ্ডনকলার পারিপাট্যে, নিখুঁত ছন্দ নৈপুণ্যে তাঁরা কাব্যদেহকে সুসজ্জিত করে তুলতেন। প্রখ্যাত সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ) বলছেন :

> 'সাধারণত সরল, ভাবপ্রধান গ্রাম্য শ্রোতৃবৃন্দের যে উপায়ে চিত্তরঞ্জন করা যায়, চতুর সুশিক্ষিত নাগরিকবর্গের মন আকর্ষণ করিতে তদপেক্ষা ভিন্ন উপায়ের প্রয়োজন হয়। রাজা ও সভাসদেরা কবির নিকট প্রত্যাশা করেন সরল মর্মস্পর্শী আবেগের পরিবর্তে চমকপ্রদ তীক্ষ্ণাগ্র উক্তিপরম্পরা, সাধারণ বিষয়কে অসাধারণ বেশে সাজাইবার কৌশল, শব্দবিন্যাস ও উপমা নির্বাচনের বিশেষ পারিপাট্য।'[৮]

সুতরাং ভোগবাদী সৌন্দর্য চেতনা, মননশীলতা, আলঙ্কারিক শিল্পনৈপুণ্যের মতো গুণাবলী যেমন রাজসভা কাব্যের মধ্যে লক্ষিত হয় তেমনি কখনো কখনো ইন্দ্রিয়-সর্বস্ব দেহলোলুপতা, হৃদয়াবেগহীন ভোগ-সর্বস্বতা, চটুল নাগরিকতা, অতি-আলঙ্কারিক কৃত্রিমতা জাতীয় দোষগুলিও সে কাব্যকে স্পর্শ করেই যায়।

আসলে 'রাজসভার কবি যেহেতু রাজসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেই কারণে রাজ্যের ও রাজার উত্থানপতনের সঙ্গে তাঁর ভাগ্য জড়িত এবং যুদ্ধ, সন্ধি, চক্রান্ত ইত্যাদি বৃহত্তর রাজনীতির আবর্তে কবিজীবন পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত। সম্পদে-বিপদে রাজসভার এই অভিজ্ঞতা সভাকবির কাব্যোপজীবী সম্পদ। রাজসভার ঐশ্বর্য-সম্পদ, সন্দেহ-ঈর্ষা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিলাস-ব্যসন, কামিনী-কাঞ্চন, নাগরিক আচার-আচরণ, মার্জিত আদব কায়দা ও স্তুতি নিন্দা সবকিছু মিলিয়ে রাজসভার কবি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি জীবনদৃষ্টির অধিকারী---ব্যাপক অর্থে এটাই কবির রাজসভার অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার অভাবে একজন কবি রাজ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেও রাজসভার কবি নাও হতে পারেন।'[৯] উদাহরণ হিসেবে আমরা কবি ভারতচন্দ্র (১৭১০-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ) এবং ভক্ত কবি রামপ্রসাদের (১৭২০-১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ করতে পারি। 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'[১০] একান্তভাবেই রাজসভাকবির জীবন-অভিজ্ঞতার ফসল। যাবতীয় লক্ষণ বিচার করে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রবীন্দ্রনাথের কথা অনুযায়ী 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'। অন্যদিকে ভক্ত-কবি সাধক রামপ্রসাদ রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেও তিনি রাজসভার কবি নন, তাঁর যাবতীয় রচনায় মেলে জনসভার কবির মৃত্তিকা-গন্ধী জীবনঘনিষ্ঠতার লক্ষণ।

যাই হোক গৌড়বঙ্গের রাজসভাকবিদের প্রাচীন রচনা নিদর্শনের সন্ধান মেলে বেশ কিছু শিলালিপিতে ও তাম্রশাসনে। বিশেষত পাল রাজবংশের আমল থেকেই এই জাতীয় শাসনগুলির নিদর্শন পাওয়া যায়। ধর্মপালের খালিমপুর শাসন, দেবপালের

নালন্দা ও দিনাজপুর শাসন, নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসন ইত্যাদি সভাকবিদের দ্বারা রচিত। লক্ষণসেনের আমলের তর্পণদীঘি, মাধাইনগর, শক্তিপুর শাসনগুলিও তার দৃষ্টান্তবাহী। এছাড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সভাকাব্যের সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে পালরাজাদের আমলে রচিত সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' এর কথা বলা যেতে পারে। আসলে বাংলাদেশে সাহিত্য ও সাহিত্যিককে পৃষ্ঠপোষক যুগের বৃত্তে প্রথম দেখা গিয়েছিল পাল যুগেই। পাল বংশের রাজা রামপালের কীর্তি বর্ণনা করে সন্ধ্যাকর নন্দী যে রামচরিত রচনা করেছিলেন তাকেই বাংলাদেশে পৃষ্ঠপোষিত সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। রাজন্য-চরিত রচনা সভাকবিদের একটি অন্যতম কৃতিত্ব বলে গণ্য করা হত। এক্ষেত্রে আমরা কবি বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', বিহ্লনের 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত', কলহনের 'রাজতরঙ্গিণী' ইত্যাদির নামোল্লেখ করতে পারি। তবে সন্ধ্যাকর নন্দী নিজের কাব্যে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে রাজা রামপালের তুলনা করে কাব্যটিকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছেন। রামচন্দ্রের পৌরাণিক কাহিনির পাশাপাশি সমান্তরালভাবে রামপাল ও তাঁর পুত্র মদনপালের যে ঐতিহাসিক বিবরণ সন্ধ্যাকর নন্দী রচনা করেছেন, তা এই কাব্যকে অনেকাংশে ঐতিহাসিক করে তুলতে সাহায্য করেছে। তাছাড়া কাব্যের প্রথমে 'ওঁ শ্রীঘনায় নমঃ সদা' বলে বুদ্ধের বন্দনা করা হয়েছে, কারণ পাল-আমলে রাজধর্ম ছিল বৌদ্ধ।

পালবংশের পতন পরবর্তীকালে সেন রাজবংশের উত্থান ঘটে। বিশেষত লক্ষ্মণসেনের আমলের নাগরিক জীবনযাত্রার বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর সভাকবিদের রচনায়। লক্ষ্মণ সেনের সময় প্রধান প্রধান কবিরা ছিলেন উমাপতিধর, শরণ, গোবর্ধন, ধোয়ী এবং জয়দেব। এঁদের কাব্যে রাজকীয় ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরে পূর্ণ অভিজাত জীবনের ছবি ধরা পড়েছে কিন্তু সাধারণ মানব-জীবনকথা সেখানেও অনুপস্থিত। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন রাজসভার অধিকাংশ সাহিত্যই কিন্তু রচিত হয়েছিল দেবভাষা সংস্কৃতে। প্রাকৃত ভাষার স্থান সেখানে ছিল না। অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে নির্গত সদ্যোজাত বাংলা ভাষাকে সাহিত্যচর্চার ভাষা হিসেবে বিবেচনা করার প্রশ্নই ছিল না। বিশেষত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক সেন-রাজসভা ছিল সংস্কৃত চর্চার অন্যতম কেন্দ্র। স্মৃতি, শাস্ত্র, ন্যায়, অলঙ্কারের পাশাপাশি এখানে কাব্যচর্চাতেও সংস্কৃত ছিল অগ্রণী ভাষা। বিশেষত কাব্যকে রাজকীয় আভিজাত্য দানের জন্য সংস্কৃতের শরণাপন্ন হতেই হত। গোবর্ধনাচার্য যদিও স্বীকার করেছিলেন শৃঙ্গারকথা প্রাকৃত ভাষাতেই অধিক মনোহর, তবুও তিনি কিছুটা বলপ্রয়োগ করেই তাকে সংস্কৃতের দিকে টেনে নিয়ে গেছেন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের ক্ষেত্রেও সেকথা প্রযোজ্য হতে পারে।

রাজার রাজগৌরব এবং দেবতার ঐশ্বর্য-মহিমা সম্পর্কে সচেতন হলেও সেন রাজসভার কাব্যে কবিরা মূলত আদিরসের চর্চাতেই মনোনিবেশ করেছিলেন। প্রধানত

রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করে রাজসভায় শুরু হয়েছিল মদন-মহোৎসব। 'আর্যাসপ্তশতী'র কিছু কিছু আর্যায় এবং 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। শৃঙ্গারবিলাসী রাজা ও তাঁর পারিষদবর্গ কাম-তরল ফেনিল আদিরসের মোহমদিরায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে গেছেন সেখানে। 'আর্যাসপ্তশতী', 'পবনদূত' বা 'গীতগোবিন্দ'র ছত্রে ছত্রে তার নিদর্শন রয়েছে। প্রেমের ক্ষেত্রে তাঁরা মূলত দেহবাদী, বিশেষ করে 'অঙ্গ নিয়ে অনঙ্গচর্চা' সেখানে একটি প্রিয় বিষয়। দেবতার প্রেমলীলা, নৃপতির কেলিবিলাস, নাগরিকদের শৃঙ্গারচর্চাই বারে বারে ঘুরে ফিরে ধরা পড়ছিল সাহিত্যের পাতায়। প্রখ্যাত কবি জয়দেবের মতে :

'শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয় রচনৈরাচার্য গোবর্ধন স্পর্ধী কোহপি ন বিশ্রুতঃ'[১১]

অর্থাৎ শৃঙ্গার রসের সৎ ও পরিমিত রচনায় গোবর্ধনের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। এমনকি 'আর্যাসপ্তশতী'র ৫১ সংখ্যক আর্যায় গোবর্ধন নিজেই জানিয়েছেন :

'গোবর্ধনের আর্যাসমূহ কোমল পদবিশিষ্ট, শোভন রীতিমণ্ডিত,
রসপুষ্ট ও সহৃদয়জনের অভিসারিকা, এ হল বিশদ অদ্বৈত
মদনানন্দ প্রতিপাদক উপনিষদ।'[১২]

তবে গোবর্ধনকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা হলেও শৃঙ্গার-বিলাসের চিত্রাঙ্কনে বাকি কবিদের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায়না।

রাজা লক্ষ্মণসেনের সভা যখন এহেন বিলাস-কলার চর্চায় নিমজ্জিত, সেই পরিস্থিতিতেই ঘটে তুর্কি আক্রমণ। লক্ষ্মণসেনকে পরাস্ত করে ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি বাংলায় মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তাঁদের একচ্ছত্র আধিপত্যের মাঝখানে একবার রাজা গণেশের হাত ধরে হিন্দুর রাজত্ব মাথাচাড়া দিয়েছিল। কিন্তু তা দীর্ঘায়িত হতে পারেনি। বরং তুর্কি আক্রমণ পরবর্তী গৌড়-বঙ্গের ইতিহাস একেবারেই রণোন্মত্ত প্রতিপত্তিশালী মুসলিম শাসকের রাজত্বের ইতিহাস। তুর্কি আক্রমণ পরবর্তী ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে রীতিমতো বন্ধ্যাত্ব নেমে আসে। ইতিহাসের পট পরিবর্তিত হয় কিন্তু সাহিত্যে তার প্রতিফলন দেখা যায় না। আসলে রাষ্ট্রবিপ্লব ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সাহিত্যচর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃজনে সক্ষম ছিল না। সমালোচক ভূদেব চৌধুরী (১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ) যথার্থই বলেছেন :

'১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহি সুশাসন প্রবর্তনের আগে পর্যন্ত বাঙালির সার্বিক জীবন এক নীরন্ধ্র বিনষ্টির ঐতিহ্যে ভরপুর হয়েছিল। স্বভাবতই জীবনের এই বিপর্যয়ের সময়ে কালজয়ী কোনো সৃজনকর্ম সম্ভব হয়নি। নিছক গতানুগতিকতার ধারায় যা কিছু রচিত হয়েছিল, তাও সর্বাত্মক ধ্বংসের হাত থেকে প্রায়ই রক্ষা না পাবারই কথা। প্রধানত এই কারণেই বাংলা

> সাহিত্যের ইতিহাসে আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কাল সৃজনহীন ঊষরতায় আচ্ছন্ন বলে মনে হয়।'[১৩]

বাংলায় ইলিয়াস শাহি বংশের প্রতিষ্ঠা করেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (শাসনকাল ১৩৪২-১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দ)। ঘটনাপরম্পরায় ইলিয়াস শাহি ও হুসেন শাহি বংশের কয়েকজন সুশাসক সিংহাসনে আরোহণ করলে বাংলা সাহিত্য অনেকাংশে উপকৃত হয়। পাঠান শাসিত বঙ্গদেশে একেবারে প্রথম পর্যায়ে বাঙালির স্বাতন্ত্র্য বিপর্যস্ত হলেও পরবর্তী ধাপে তা ক্রমশ পরিপুষ্টির পথেই এগিয়ে যায়। বিচ্ছিন্নভাবে আক্রান্ত নানা স্থানে প্রথমে বিশৃঙ্খলা আর উৎপীড়ন প্রবল হলেও পরে তা আস্তে আস্তে বাংলার স্বকীয় জীবন-ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে কোনো সময়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (শাসনকাল ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ) অনুভব করেন :

> '...that the Ilyas Shahi dynasty, whom he supplanted, represented Bengal's hopes and aspirations and had almost become a national institution.'[১৪]

ইলিয়াস শাহি বাংলার ঐতিহ্য আর প্রতিশ্রুতিকে অনুসরণ করেই আলাউদ্দিন হুসেন শাহ অগ্রসর হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে ঐতিহাসিকের বক্তব্যে :

> 'With these (Ilyas Shahi) aspirations he identified himself so whole heartedly that his alien origin was forgotton and his Hindu subjects compared him to the incarnation of Krishna. By recalling the old aristocracy to power and position, he showed that though a new dynasty had come to power, the old traditions were to continue.'[১৫]

বস্তুত সেকালের শাসক শোষণের তুলনায় শাসন এবং জন-পরিপালনই করেছিলেন বেশি। ফলে সভাসাহিত্যও চর্চিত হবার মত ভূমি এবং অবকাশ পেয়েছিল বললে ভুল হবে না। রাজসভায় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা ও গুণীজনের সমাদরের কথা বিশদে জানা যায় নাসিরুদ্দিন মামুদের পুত্র রুকনুদ্দিন বারবক শাহের রাজত্বকালে এবং পরে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ, নসরৎ শাহ, ফিরোজ শাহের সময়ে। প্রকৃত অর্থেই ইলিয়াস শাহি ও হুসেন শাহি বংশের দীর্ঘ রাজত্বকাল বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি

গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। রুকনুদ্দিন সুশাসক ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায় রুকনুদ্দিন সম্পর্কে এক শিলালিপিতে উৎকীর্ণ একটি প্রশস্তির উল্লেখ করে বলেছেন :

> 'শাহ সুলতান রুকন-অল-দুনিয়া-ওয়াল-দীন আমাদের সুলতান বারবক শাহ জ্ঞানী এবং মহীয়ান, ইনি তাঁরই পুত্র যাঁর খ্যাতি দেশে দেশে বিস্তৃত হয়েছে সেই সুলতান মামুদ শাহ ন্যায়পরায়ণ এবং ভদ্র। দুই ইরাকে কে এমন মহান হৃদয় সুলতান আছেন বারবক শাহের মত? সিরিয়া এবং অল-ইয়েমেনেও কি আছেন? না। বিধাতার সমগ্র রাজ্যে আর কেউই নেই যিনি মহত্ত্বে তাঁর সমান। তাঁর সময়ে তিনি অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়।'[১৬]

বারবক শাহ অসাম্প্রদায়িক শাসক ছিলেন। 'শরফনামা' রচয়িতা ইব্রাহিম ফারুকী প্রমুখ মুসলিম পণ্ডিতেরা যেমন সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন, তেমনি নরহরি বিশারদ, বৃহস্পতি মিশ্র প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, কৃত্তিবাস বা মালাধর বসুর মত কবিও তাঁর রাজসভায় খ্যাতি, মর্যাদা, দাক্ষিণ্যলাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'এ গৌড়েশ্বরের নামোল্লেখ না থাকলেও নানা সূত্র ধরে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এই গৌড়েশ্বর সম্ভবত রুকনুদ্দিনই হবেন। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে উল্লেখ আছে :

> 'নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
> খুসি হইয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল।।
> কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
> রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের আছড়া।।
> রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
> পাত্র মিত্রে বলে গোসাঞি করিলে সম্মান।।
> পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
> গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা।।'[১৭]

মালাধর বসুর গ্রন্থ রচনায় সন তারিখ বিচার করেও পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে রুকনুদ্দিনের সময়েই মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেছিলেন এবং 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ করেছিলেন :

> 'গুণ নাই, অধম মুই, নাহি কোন জ্ঞান।
> গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।।'[১৮]

তাছাড়া বারবক শাহের রাজত্বকালে বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্র। তাঁর রচিত 'স্মৃতিরত্নহার' বাংলার ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ইতিহাসে এক অমূল্য

গ্রন্থ। এ প্রসঙ্গেই বলে রাখা দরকার, রাজসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেও এঁদের রচনা সভাকাব্যের ত্রুটি গুলি থেকে অনেকাংশে মুক্ত। বারবক শাহের রাজসভায় একদিকে সংস্কৃত পণ্ডিতদের সংস্কৃত চর্চা ও অন্যদিকে মুসলিম কবিদের আরবি-ফারসি চর্চার ফাঁকে ফাঁকে বাংলা চর্চার যে অবকাশ ছিল তাতে রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি মহাকাব্যের অনুবাদের উৎসাহ দেখা দিয়েছিল। বাংলা ভাষায় রামায়ণ বা মহাভারতের চর্চা পরবর্তীকালের দেশীয় রাজাদের সভাসাহিত্যের একটি প্রধান বিশেষত্ব হয়ে উঠেছিল। হুসেন শাহ চট্টগ্রাম অধিকার করার পর পরাগল খাঁ নামে তাঁর এক লস্করকে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের অনুবাদে ব্রতী হন। কাব্যের নাম ছিল 'পাণ্ডব বিজয়'। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুকুমার সেন (১৯০০-১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ করেছেন :

> 'আশ্চর্যের বিষয় বাঙ্গালায় লেখা প্রথম যে মহাভারত-কাহিনী পাইতেছি তাহা এক মুসলমান সেনাপতি শাসনকর্তার অভিপ্রায়ে তাঁহারই সভাকবির রচনা।'[১৯]

বাংলায় পরবর্তী মহাভারতের অনুবাদ ঘটেছিল নসরৎ শাহের (শাসনকাল ১৫১৯-১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ) আমলে পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায়। শ্রীকর নন্দী মূলত জৈমিনি মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বটির অনুবাদে মনোনিবেশ করেছিলেন। অনুমিত হয় মহাভারতের মহাযুদ্ধের উত্তেজনাই সম্ভবত রাজন্যবর্গকে বারে বারে আকর্ষণ করেছিল, যার ফলে এর চর্চা কখনো বন্ধ হয়নি। একথা বলার কারণ, পরবর্তী ক্ষেত্রে কুচবিহার, বর্ধমান প্রভৃতি রাজসভাতেও মহাভারত চর্চার কথা জানতে পারা যায়। বিশেষত কুচবিহার ছিল এই জাতীয় অনুবাদ চর্চার পীঠস্থান। কুচবিহারের রাজারা প্রায় সকলেই সভাকবিদের রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আসলে কেবল গৌড় নয়, সীমান্তবর্তী রাজসভাগুলোতেও সভাসাহিত্য বিকাশের অনেকখানি সম্ভাবনা ছিল। গৌড়ের সমস্ত সুলতানরাই যে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এমনটা নয়। অনেকেরই অধিক আগ্রহ ছিল রণ-রক্তে। কিন্তু বাংলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের স্বাধীন রাজসভাগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে বাংলা সাহিত্যচর্চার প্রচলন ছিল। রাজসভা সাহিত্য নিয়ে দীর্ঘ গবেষণাকারী সমালোচক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন :

> 'খ্রীষ্টিয় চতুর্দশ শতকে দুর্লভনারায়ণের সময় থেকে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতকে হরেন্দ্রনারায়ণ পর্যন্ত ছশো বছর ধরে কুচবিহার রাজসভায় ক্লাসিকস ও পুরাণচর্চার এত নিদর্শন বাংলাদেশের আর কোনো রাজসভায় পাওয়া যায় না।'[২০]

রাজা নরনারায়ণের সভাকবি অনন্ত কদলী কীর্তনের ভঙ্গিতে রামায়ণ কাহিনি রচনা করেন, নাম দেন 'শ্রীরাম কীর্তন'। রাজমন্ত্রী কবীন্দ্র পাত্র অষ্টাদশ মহাভারতের অনুবাদ

করেন, কংসারি মহাভারতের বিরাটপর্বের কিছুটা অনুবাদ করেন, দ্বিজ কল্যাণচন্দ্র রচনা করেন 'রামায়ণ-চন্দ্রিকা'। নরনারায়ণের পুত্র রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের আমলে মহাভারতের অংশবিশেষ অনুবাদ করেন বিপ্র বিশারদ, গীতার অনুবাদ করেন গোবিন্দ মিশ্র। বীরনারায়ণের সভাকবি শ্রী গোবিন্দ কবিশেখর মহাভারতের বিরাটপর্বের অনুবাদ করেন। রাজা প্রাণনারায়ণের সময় শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ মহাভারতের আদি ও দ্রোণপর্বের অনুবাদ করেন। এই ধারার অনুবর্তন চলতেই থাকে। রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করেন।

বর্ধমান রাজসভাতেও এই দুই মহাকাব্যের চর্চা ছিল অব্যাহত। বিশেষত সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত চর্চায় এই রাজসভার উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের রুচিশীলতা বিষয়ে বর্ধমান–রাজ মহতাব চাঁদের মনে সন্দেহ থাকায় তিনি মূলানুগ রামায়ণের অনুবাদে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং মহাভারতের অনুবাদেও তাঁর সমধিক আগ্রহ ছিল। বিষ্ণুপুরের রাজসভাতেও রামায়ণ ও মহাভারতের সারানুবাদ হয়েছিল যথাক্রমে রাজা রঘুনাথ সিংহ ও গোপাল সিংহের রাজত্বকালে।

তাছাড়া রাজাদের চরিত সাহিত্যের দিকেও কবিদের কিছুটা প্রবণতা লক্ষিত হয়। আগেই সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত এর উল্লেখ করেছি। বিষ্ণুপুরেও পুরাণচর্চার অবসরে 'রাজমল্লবীর বন্দনা' রচিত হয়েছে, মিথিলার কবি বিদ্যাপতি কীর্তিসিংহের কীর্তি অবলম্বনে 'কীর্তিলতা', 'কীর্তিপতাকা' রচনা করেছেন, বর্ধমানে রচিত হয়েছে 'চিত্রচম্পূ', ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'এ কৃষ্ণনগরের রাজাদের অতীত গৌরবগাথার জয়জয়কার আছে। তাছাড়া রাজবংশের ইতিহাস রচনা ভারতবর্ষে নতুন নয়। এভাবেই জন্ম হয়েছিল কাশ্মীরের রাজবংশের ইতিহাসকেন্দ্রিক 'রাজতরঙ্গিণী', মহীশূরের ইতিবৃত্ত 'রাজাবলী কথে' ইত্যাদির। এ প্রসঙ্গে ত্রিপুরা রাজবংশের ধারাবাহিক ইতিহাস চর্চার কথাটিও বলে রাখা প্রয়োজন। সেখানে সংস্কৃত ভাষায় লেখা 'রাজরত্নাকর' ও বাংলায় লেখা 'রাজমালা' খুবই তাৎপর্যপূর্ণ দুটি গ্রন্থ।

তাছাড়া মান্য নাগরিক জীবনের অভিজাত পরিবেশে রোমান্স রসের চর্চা খুবই আদরণীয় ছিল। তত্ত্ব ও ধর্মকথার চেয়ে প্রেম ও যুদ্ধের উন্মাদনা পাঠককে অধিকমাত্রায় আকর্ষণ করত। তাই তার চাহিদাও ছিল যথেষ্ট। বিশেষত দেব-দেবী বা রাজাকে কেন্দ্র করে আদিরসের চর্চা ছিল খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয়। এমনকি যে সমস্ত পদগুলি এ সময়ে রচিত হয়েছিল তাতেও বৈষ্ণবের সম্প্রদায়ের ভাবুকতার চেয়েও বেশি মাত্রায় ছিল নাগরিক বৈদগ্ধ। রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করে সেখানে শৃঙ্গারোপযোগী বিলাস কলার চর্চা হত। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' থেকে 'মৈথিল কোকিল' বা 'অভিনব জয়দেব' বিদ্যাপতির পদে তারই দৃষ্টান্ত মেলে। যদিও বিদ্যাপতির সম্ভোগ-মুখ্য পদের পাশাপাশি বিরহমুখ্য পদগুলি বিচার করলে একথা মানতেই হবে প্রথম পর্বে বিদ্যাপতির

রচনারীতি ও মানস-ভঙ্গী রাজসভার রুচি দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হলেও উত্তরকালে সেই প্রবণতা অনেকাংশে অবসিত হয়েছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আলাদা। আমাদের আলোচ্য মান্য নাগরিক সাহিত্যের ধারাটি পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখেছি লক্ষ্মণসেনের পরাজয়ের পর তুর্কি আক্রমণে বিধ্বস্ত বাংলাদেশ বেশ কিছুকাল ছিল ফলনহীন। তারপর রাষ্ট্রবিপ্লবের পর্ব অতিক্রান্ত হলে গৌড়ের মুসলিম সুলতানদের উৎসাহে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নতুন প্রাণের স্পন্দন জেগে উঠতে থাকে। দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ) এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন :

> 'মুসলমানকর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।'[২১]

ইতিমধ্যে মধ্যযুগীয় বাংলার আকাশ ক্রমশ এক মানবতাবাদী আশ্বাসের সন্ধান পাচ্ছিল, প্রীতি ও সমন্বয়ের একটা বাতাবরণ দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনছিল। সমস্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মের মধ্যে সৃষ্টিশীল সমন্বয়ে উপনীত হওয়ার একটা তাগিদও লক্ষিত হচ্ছিল। অরাজকতা, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, অত্যাচার, মাৎস্যন্যায় পেরিয়ে যুগ ও জীবন নতুন পথ সন্ধান করছিল। এই পটভূমিতেই শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ) আবির্ভাব ঘটে। তাঁর জীবন ও চেতনা বাঙালির জীবন ও সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে বাঙালির দীর্ঘকালীন মূর্ছাভঙ্গ এবং এক নব সচেতনতা সঞ্চারে চৈতন্যদেবের ভূমিকা ইতিহাসকেই বদলে দিয়েছিল। বাঙালির কৃষ্টি সংস্কৃতি ও সাহিত্য সেই প্রথম মুক্তিমন্ত্র শুনতে পেয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে দেওয়া হয়েছিল 'সুবর্ণযুগ-'এর অভিধা, যার মূলে যুগ ও জাতির জীবনে চৈতন্যদেবের অবদানকে অস্বীকার করা যায়না। গুণগত ও পরিমাণগত উভয়বিধ বৈচিত্র্যই এই সুবর্ণযুগ অভিধার কারণ। সামাজিক মুক্তি আসলে সমস্ত রকমের সৃজন কর্মকেই গতি দান করে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এমনকি তাঁর সর্বাত্মক প্রভাব থেকে যে সভাসাহিত্য মুক্ত হতে পারেনি তার প্রমাণ রয়েছে। সমালোচক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন :

> 'শ্রীচৈতন্যদেব গৌড় রাজসভার পার্শ্ববর্তী গ্রাম রামকেলি পর্যন্ত এসেছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণবভক্তিস্রোত সেই পর্যন্ত এসেই থেমে যায়নি, হোসেন শাহের রাজসভাসদদের মধ্যে তা নিগূঢ়ভাবে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল।'[২২]

হোসেন শাহের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন যে রূপ গোস্বামী, তিনিই পরে শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেন। রাজসভায় থাকাকালীন রচিত 'হংসদূত' কাব্যে তাঁর কৃষ্ণভক্তির পরিচয় মিলেছে। চিরঞ্জীব সেন, দামোদর, সূর্যদাস সরখেল,

রামচন্দ্র দাস প্রমুখের নামোল্লেখও করেছেন দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং সে প্রসঙ্গে জানিয়েছেন : 'এঁদের কৃষ্ণলীলা সংক্রান্ত দেবস্তুতি শ্লোকগুলি চৈতন্য ভক্তিরসের প্রতিফলন।'[২৩]

তবে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে ষোড়শ শতাব্দীতে এক ভিন্নমাত্রিক নাগরিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। তাঁর যে ধর্মবিপ্লব, তা সমাজের এতকালের চিরায়ত কাঠামোয় কুঠারাঘাত করেছিল। তিনি যে নামভক্তি ও কীর্তনের প্লাবন এনেছিলেন তাতে অভিজাত-অনভিজাতের ছিল সমান অধিকার। কীর্তনগানের রূপাঙ্গিকের মাধ্যমে ভাবাবেগ প্রকাশের সুযোগ বেশি এবং প্রকৃতির দিক থেকে তা গণমুখী বলে শ্রীচৈতন্যদেব অত্যন্ত সচেতনভাবে কীর্তনকেই প্রচার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এরই সঙ্গে ভাব-নৃত্য মিশে হয়ে উঠেছিল জন-চিত্ত মনোহারী। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে উল্লেখ আছে :

'নগরিয়া লোকে যবে প্রভু আজ্ঞা দিলা।
ঘরে ঘরে সংকীর্তন করিতে লাগিলা।। ...
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায়।।
আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস।
মধ্যে নাচে আচার্য গোঁসাই পরম উল্লাস।।
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
তাঁর সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ।।'[২৪]

চৈতন্যদেবের এই নগর সংকীর্তন 'শুধুমাত্র ধর্মীয় আচারে সীমাবদ্ধ ছিল না; একটা ব্যাপক আনন্দোৎসবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। ধর্মের সীমানা ডিঙিয়ে, জাতিভেদ-অস্পৃশ্যতা তুচ্ছ করে নবদ্বীপ শহরের নগর সংকীর্তন সে যুগের স্থানীয় establishment বা সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের সামনে একটা প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্কৃতি রূপে দেখা দিয়েছিল'[২৫] বলে সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন। একদিকে শ্রীচৈতন্যদেব অনার্য-অস্পৃশ্যকে এক পঙক্তিতে এনে ফেলেছিলেন অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে। বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত' এ স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন :

'সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচন্দেরে।।'[২৬]

অন্যদিকে প্রকাশ্য নগর সংকীর্তনে সর্বশ্রেণির স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ তৎকালের সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায় এবং মুসলিম শাসকবর্গকেও বিচলিত করে তুলেছিল। শ্রেণি বিন্যস্ত সমাজের ভিত্তিমূলে আঘাত লাগায় সমাজপতিরা বিচলিত হয়েছিলেন। আর পরাভূত, নির্জীব এক শ্রেণির মধ্যে নতুন রক্তস্রোত সঞ্চারিত হলে তাদের পুনরুত্থানের আশঙ্কায় কেঁপে উঠেছিল শাসকের সিংহাসন। স্বয়ং চৈতন্যদেবকে দমাবার চেষ্টাও কম

হয়নি। নবদ্বীপের কাজীর সঙ্গে বিরোধ তার সাক্ষ্য-বাহী। তাছাড়া সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছিল :

'কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ বার বার।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়।।'[২৭]

কিন্তু পরিশেষে চৈতন্যদেবের দিব্য-জীবন বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে ভরিয়ে দিল নতুন নতুন সম্পদে। শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক ক্ষমতার প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত ছিলেন কবিরা, আর এর পিছনে ছিল পরাজিতের মনস্তত্ত্ব। বাস্তব চৈতন্যের অসাধারণ গুণাবলী ভক্তদের কাছে তাঁকে অ-সাধারণ রূপেই প্রতিপন্ন করেছিল। বাস্তব জীবনে চাহিদা আর যোগানের অসাম্য, মানসিক যন্ত্রণা, প্রতি মুহূর্তের পরাভব আর আত্মগ্লানি একটা হেরে যাওয়ার মানসিকতা তৈরি করছিল বাঙালির মননে। দেবতা নয়, মানুষ শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে দেবত্বের সন্ধান পেয়ে তাই সাহিত্য ক্ষেত্রে ও সমাজজীবনে নতুন ফসল ফলে উঠেছিল। ফলস্বরূপ বাংলা সাহিত্যের যুগ-বিভাজিত হয়ে গেল দুই ভাগে, এই আলোকময় পুরুষকে কেন্দ্র করে---প্রাক্-চৈতন্য যুগ ও উত্তর চৈতন্য যুগ। বস্তুত চৈতন্যজীবন আর কর্মের ঐতিহ্যের স্বভাব-ধর্মকে যথাযথ মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করে না দেখতে পেলে মধ্যযুগে বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির সত্য ও প্রকৃত মূল্যায়ন অসম্ভব। তবে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতিভার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সমালোচক ভূদেব চৌধুরী যথার্থ বলেছেন :

> 'চৈতন্য-প্রতিভার নিরপেক্ষ স্বরূপ অবধারণের জন্য তাঁকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একান্ত কুক্ষিবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে দেখতে হবে। প্রধানত ধর্মাশ্রয়ী হলেও চৈতন্যের ব্যক্তিত্ব কোনো পর্যায়েই সাম্প্রদায়িক ছিল না। বস্তুত কেবল এই কারণেই মধ্যযুগের প্রত্যেক ধর্ম–পর্যায়ভুক্ত সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে চৈতন্য–চেতনার প্রেমানুরক্তি-মূলক আবেদন ছিল সর্বজনীন।'[২৮]

তবে চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে তাঁকে কেন্দ্র করে প্রবাহিত আবেগগত এবং বুদ্ধিগত চর্চার একটি ধারা বহমান থাকলেও কালের নিয়মে তাতে ভাঁটা পড়তে থাকে। পণ্ডিত সুকুমার সেনের কথা অনুসারে সেই সময় চৈতন্য-প্রভাবিত সাহিত্যকর্মগুলি 'গতানুগতিকতার ফলে ঔজ্জ্বল্যে ও চমৎকারিত্বে হীন হয়ে পড়ছিল।'[২৯]

এই শতাব্দীতে বৈষ্ণব-কবির অকৃত্রিম হৃদয়োচ্ছ্বাস নতুন পথ খুঁজে পাচ্ছিল না আর। প্রায়ই পুনরুক্তির আবর্তে পড়ে তা বিস্বাদ হতে শুরু করেছিল। বিশেষত সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সাম্প্রদায়িকতা আর দেহ-সাধনার আবিলতার মধ্যে তা ডুবে যেতে থাকে। ইতিহাসের পট আরেকবার পরিবর্তনের সামনে এসে দাঁড়ায়। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই বিনষ্টি ও নব-অভ্যুত্থান কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়, আসলে একটি

অনিবার্য প্রক্রিয়া। ইতিহাসের ধারাপথেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পাঠান শাসনের অবসানে এই ষোড়শ শতকের শেষভাগ নাগাদ বাংলাদেশ মুঘল অধিকারভুক্ত হয়। বিশেষত সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ও তদুত্তর সময়ে বাংলাদেশ সর্বভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হয়। জাহাঙ্গীরের রাজত্বে তার সর্বাত্মক প্রয়োগ ঘটে। শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রাভিমুখী হতে থাকে, জীবন হতে থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকের মন্তব্য :

> 'In one word, during the first century of Mughal rule(1575-1675) the outer world came to Bengal and Bengal went out herself to the outer world, and the economic, social and cultural changes that grew out of this mingling of peoples mark a most important and distinct stage in the evolution of modern Bengal.'[৩০]

এই বক্তব্যে মুঘল শাসনাধীন বাংলার পক্ষে বহির্ব্যাপ্তির যে অভাবিত সুযোগের ইঙ্গিত রয়েছে তার ফলে বাঙালির পার্থিব জীবনে আর্থিক সমৃদ্ধির আর বিলাসের সুবিধা হয়তো অবারিত হয়েছিল কিন্তু এই অভিনব সংযোগের সূত্রে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবন ও সাহিত্য নতুন কোনো মূল্যবোধ বা জীবনাদর্শের আশ্রয় লাভ করতে পেরেছিল নাকি বৈষয়িক সমৃদ্ধির আকর্ষণ বৃহত্তর জীবন-ক্ষেত্রে বিনষ্টির পথকেই অবারিত করেছিল তা পরীক্ষাধীন। সমৃদ্ধির অন্তরালে যে অনন্ত সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি ছিল তা নতুন ফসল ফলাতে পারল কিনা তা অবশ্যই বিচার্য। বাংলার মুঘল শাসক সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হল এই যে :

> '...Mughal rule in Bengal preserved its character of a foreign conquest. The viceroys and officers came and went without taking any real interest in the life of the province.'[৩১]

তুর্কি আক্রমণ পরবর্তী প্রহরে পাঠান শাসকেরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকাংশে বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেও মুঘল শাসক ও তাদের শাসন সহজে এই একাত্মতার স্রোতে মিশে যেতে পারেনি। তারা ছিল বাঙালি জীবনধারার পক্ষে একান্তভাবেই বিজাতীয়। ভাষা, শিক্ষা, রুচি, সংস্কৃতি সবই ছিল ভিন্ন। বিশেষত রাষ্ট্রের ভাষা যখন আরবি-ফারসি। রাজদরবারে প্রতিষ্ঠালাভ করতে গেলে, আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে গেলে সেই ভাষায় দক্ষতা অতি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। স্বয়ং ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত তার সাক্ষ্য দেয়। অল্প বয়সে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করে বাড়ি

আসায় গুরুজনদের কাছে তিনি যথেষ্ট নিন্দিত হয়েছিলেন এবং পরে ফারসিতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে তবে প্রশংসিত হন। আসলে আরবি-ফারসি শাসকের ভাষা হওয়ায় অচিরেই দরবারেও তারই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। তবে তা ব্যবহারিকতার সীমা অতিক্রম করে সার্থক সর্বজনীনতা লাভ করতে পারেনি। তাই বাংলা কাব্যের প্রকৃতিতে ফারসির ছাপ খুব একটা দেখা যায়না। অবশ্যই ভারতচন্দ্রকে ব্যতিক্রম ধরতে হবে। কিন্তু দরবারে কদর না থাকায় রাজসভা বা রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা–সাহিত্যের চর্চায় অবশ্য কিছুটা মন্দা দেখা যায়। সে এক অদ্ভুত সময়, রাষ্ট্র প্রণালীতে মুসলমানের প্রভাব প্রবেশ করেছে কিন্তু চিত্তের মধ্যে তার ক্রিয়া সর্বতোভাবে প্রবল হয়নি। মঙ্গলকাব্যে বা পদাবলির বিষয়বস্তুতে তার ছাপ সেভাবে পড়েনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ) কথায় তখন :

> 'বাহুবলের ধাক্কা দেশের উপরে খুব জোরে লেগেছে, কিন্তু কোনো নতুন চিন্তারাজ্যে কোনো নতুন সৃষ্টির উদ্যমে তার মনকে চেতিয়ে তোলে নি।'[৩২]

তার ফলে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনাও ক্রমশ দূরাগত হতে থেকেছে। নাগরিক সাহিত্য বা সংস্কৃতির কোনো নতুন দিগন্ত তখন উন্মোচিত হয়নি। প্রখ্যাত গবেষক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন :

> 'সপ্তদশ শতাব্দীতে–মোগল আমলে, ঢাকা শহর একটা কেন্দ্রীয় প্রশাসনের প্রাদেশিক রাজধানী রূপে প্রতিষ্ঠিত হল। এর আগে, ঢাকা নিশ্চয়ই একটি জনপদ ছিল। কিন্তু প্রাক্ মোগল যুগে বা তার পরবর্তী একশো বছরের রাজধানীর জীবনেও (১৬১০ থেকে ১৭১৩-১৪ যখন মোগল প্রশাসন বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করে), ঢাকা থেকে কোনো উল্লেখযোগ্য নাগরিক সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়না।'[৩৩]

সপ্তদশ শতাব্দীতে সেই অর্থে কোনো নতুনত্বের চেতনা নেই, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরাতনের চর্বিত চর্বণ। এই প্রাণহীন নিস্তরঙ্গ পরিবেশে সতীময়না বা লোরচন্দ্রাণী ও পদ্মাবতী তমসার রাজ্যে প্রাণের হিল্লোল আনলেও সেই বিপ্লবের রেশ ধরে রাখার যোগ্যতা এই শতাব্দীর ছিল না। তাছাড়া দেববাদ নির্ভরতাকে অতিক্রম করে লৌকিক মানবিক প্রেমকাহিনির জন্মও খোদ বঙ্গভূমিতে হয়নি, হয়েছিল আরাকানে। বঙ্গের সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব প্রত্যন্তে চট্টগ্রামের সন্নিকটবর্তী আরাকান রাজ্য ছিল নিম্ন বর্মার অংশ। আরাকান রাজগণ ভিন্ন জাতি ও ভাষার লোক হলেও বঙ্গীয় ভাষা–সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বর্মারাজ কর্তৃক পরাস্ত আরাকানরাজ নরমেইখলা দীর্ঘদিন গৌড়ে আশ্রিত অবস্থায় ছিলেন। তিনি যখন হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার

করে ফিরে যান তখন তাঁর মাধ্যমেই গৌড়ীয় সংস্কৃতি ও বাংলাভাষা বাহিত হয়ে আরাকানে পৌঁছেছিল। তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় 'লোরচন্দ্রাণী বা সতীময়না' এবং 'পদ্মাবতী'র মত কাব্য সৃষ্টি করেন দৌলত কাজী বা সৈয়দ আলাওলের মত জীবন-ধর্মী কবিরা। রাজসভা-কাব্যের যাবতীয় লক্ষণ কাব্য দুটির দেহে বর্তমান। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীর মান্য নাগরিক সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার ধারায় আরাকানে জাত এই দুটি কাব্যের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। বঙ্গদেশে না হলেও বঙ্গদেশের সন্নিকটবর্তী হওয়ায় এরা বঙ্গীয় সংস্কৃতির বৃত্তে স্থান লাভ করতে সমর্থ হয়েছে।

এরপরেই অষ্টাদশ শতাব্দীর আবির্ভাব সূচিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গভূমির ইতিহাস স্বর্ণপ্রসূ নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বদলে গেছে বঙ্গভূমির আর্থ-সামাজিক চরিত্র। অরাজকতা, কৃতঘ্নতা, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের উদ্দামতা সে যুগকে করেছে জটিল। আসলে সমাজ যদি হয় বহির্কাঠামো, তার প্রাণ-ভ্রমর অবশ্যই অর্থনীতি। উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি, অবনতি তথা দেশীয় অর্থনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত থাকে গোটা দেশের ভাগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর ঐ পর্বে কেন্দ্রীয় শক্তির পতন, সিংহাসন নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, সুবাদারদের প্রাদেশিক বিদ্রোহ, বৈদেশিক আক্রমণের শঙ্কা, বর্গি হাঙ্গামা, ঔপনিবেশিক শক্তির ক্রমবিকাশ, মন্বন্তর---সব মিলে অগ্নিবর্ষী পরিস্থিতিতে জীবন জেরবার, দিশাহারা, ক্লান্ত। সমসাময়িক সমাজ পরিবেশের ক্লিষ্টতা, কলুষতা করাল ছায়া বিস্তার করেছিল জীবনের সর্বক্ষেত্রে। ফলে এই সময়ের সমাজ বা সামাজিক রুচি যে খুব উচ্চমানের হবে এমনটা আশা করা অন্যায়। তাছাড়া দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী নৈতিক রুচির মান বারে বারে পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক যুগ-রুচির মাপকাঠিতে সে যুগের বিপর্যস্ত জীবন–নীতিকে দুর্বিষহ বিকার মনে করা অসম্ভব নয়। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা উচিত নয় যে যুগ-প্লাবী বিপর্যয়ের মধ্যেও ভারতচন্দ্র প্রমুখ সেকালের রুচি-বিকারকে বাক্‌বিন্যাসের কৌশলে সৌষ্ঠবোজ্জ্বল করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙন শুরু হয়। প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সুবেদার-নবাবদের অধীনে বাংলাদেশ একটি প্রায় স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। আসলে বঙ্গের মুঘল শাসকদের চিত্তে ভোগাসক্তির সঙ্গে সঙ্গে অর্থাসক্তির প্রাবল্য ছিল। তাই এই বঙ্গভূমি থেকে যত বেশি সম্ভব মুনাফা লাভের জন্য তাঁরা ছিলেন ব্যাকুল। আরও বেশি লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাঁরা বঙ্গদেশকে শুষে নিতে পিছপা হননি। সমালোচক ভূদেব চৌধুরী যথার্থই বলেছেন :

> 'মুঘল শাসনের প্রারম্ভ থেকেই বাংলার উচ্চশ্রেণীর ক্ষমতাশালী শাসনাধিকারিগণের জীবন-চূড়ায় সম্পদ, সম্ভোগ, নীতিহীন স্বার্থপরতা কেন্দ্রিত হচ্ছিল,---অন্যদিকে নিম্নবর্তী জনসাধারণের

> জীবন-বনিয়াদে শূন্যতা এবং শুষ্কতা হয়ে উঠছিল পুঞ্জীভূত। বলা বাহুল্য, বাংলার বনেদী ভূম্যধিকারীদের মধ্যে যাঁরা আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিলেন, তাঁরাও বিত্তার্জনের এবং ভোগ-প্রাচুর্য বৃদ্ধির এই 'মহাজন পন্থা'ই অনুসরণ করেন।'[৩৪]

তাই অষ্টাদশ শতকের শুরুতে বাংলায় এসে মুর্শিদকুলি খাঁ (শাসনকাল ১৭১৭-১৭২৭ খ্রিস্টাব্দ) যখন অনুভব করেন :

> 'Like all aristocracies, these men had now fallen into indolence, negligence and improvidence,'[৩৫]

তখন আশ্চর্য হবার কিছু থাকে না। ঔরঙ্গজেবের জীবিতকালেই মুর্শিদকুলি বাংলার দেওয়ানী লাভ করে ঢাকায় এসেছিলেন এবং তারপর তিনি ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে ক্ষমতার স্থানান্তরণ করেন। মুর্শিদকুলির পর সুজাউদ্দিন (শাসনকাল ১৭২৭-১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দ), তারপর আলিবর্দি (শাসনকাল ১৭৪০-১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ) বাংলাদেশের সর্বময় শাসনকর্তা হন। আলিবর্দির মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজদৌল্লা (শাসনকাল ১৭৫৬-১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ) নবাবীর অধিকার লাভ করেন এবং তারপর ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে তাঁর পতন ঘটলে বাংলায় প্রায় পঞ্চাশ বছরের স্বাধীন নবাবীর অবসান ঘটে। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু পরবর্তী সময় থেকেই রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র নিম্ন-গাঙ্গেয় অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্ব লাভের জন্য বাণিজ্য-রত বিদেশি শক্তিগুলির তৎপরতাও বেড়ে ওঠে। সমালোচক সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন :

> 'দিল্লীর প্রভুত্ব খর্ব ও নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলে বিদেশি বাণিজ্যকুঠিগুলি স্থাপিত হওয়ার ফলে বাংলাদেশে নগরকেন্দ্রিক নব সভ্যতার পত্তন শুরু হল। মোগল শাসক সম্প্রদায় জমিদারি বংশের সৃষ্টি করেছিলেন। সে সব জমিদারগণ প্রাচীন আমলের স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন ভূস্বামীদের অনুকরণে সভা জাঁকাবার জন্য পণ্ডিত কবিদের পোষণ করতেন। এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লেখকগণ (বৈষ্ণব কবিরা ছাড়া) এই ধরণের সাহায্য লাভ করেছিলেন। ধর্মমঙ্গল রচয়িতা ঘনরামের মুরুব্বি ছিলেন বর্ধমানের রাজা কীর্তিচাঁদ। কর্ণগড়ের রাজারাম সিংহের সভাপণ্ডিত রামেশ্বর শিবায়ন কাহিনি রচনা করেছিলেন এবং নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ ভারতচন্দ্র অন্নপূর্ণামঙ্গল লিখেছিলেন।'[৩৬]

কেন্দ্রশাসনচ্যুত নবাবী আমলে নবাব দরবারে অনুগৃহীত এবং বিদেশি বণিকদের সঙ্গে যুক্ত নতুন একশ্রেণির অভিজাত জমিদারদের উত্থান ঘটেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুর্শিদাবাদে নবাবী শাসনকালে এরকম প্রতিপত্তিশালী বেশ কিছু পরিবারের

সন্ধান মেলে। যেমন---নদীয়ার কৃষ্ণনগরের রাজবংশ, বর্ধমানের রাজবংশ ইত্যাদি। নিজ নিজ পরগণার স্বাধীন নরপতিরূপে সাধারণকে শোষণ করে সংগৃহীত অর্থ রাজা-মহারাজা উপাধিপ্রাপ্ত নতুন জমিদারেরা পাঠিয়ে দিত নবাব দরবারে। আর বার্ষিক নির্দিষ্ট অর্থ চলে যেত দিল্লির বাদশাহের কোষাগারে। এভাবেই সাধারণ জনজীবনে নেমে এসেছিল শোচনীয় আর্থিক দুর্গতি আর ধনী পরিবারগুলিতে প্রবাহিত হচ্ছিল বিলাসের স্রোত। এহেন পরিস্থিতিতে কৃষ্ণনগর রাজসভাকে কেন্দ্র করে এক নতুন ধরণের শহুরে সংস্কৃতি গড়ে উঠতে থাকে বলে গবেষক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন। গ্রামে গাঁথা বাংলাদেশের প্রাণধারাকে বিচ্ছিন্ন করে জেগে ওঠে নাগরিকতার কূর্ম-পীঠ। এই রাজসভাতেই উপস্থিত হন ভারতচন্দ্র, এখানেই রচিত হয় 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য। নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অনুরোধেই অন্নদামঙ্গলের সৃষ্টি। এ কাব্যে অন্নদা-স্তুতির চেয়ে রাজস্তুতি অনেক সময়েই প্রাধান্য পেয়েছে, যুগ-প্রেক্ষিতে যা হয়তো অনিবার্য ছিল। কাহিনির মূল লক্ষ্য দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য কীর্তন যতটা, তার চেয়েও বেশি পৃষ্ঠপোষক রাজার গরিমা প্রচার, সন্দেহ নেই। অন্নদা উপলক্ষ, আসলে লক্ষ্য আশ্রয়দাতার ভজনা। রাজার পূর্বপুরুষ ভবানন্দের রাজ্যলাভ প্রসঙ্গে রাজবংশের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে এখানে। এই কাব্যের পরিকল্পনায়, রূপায়ণে রাজসভার প্রভাব সর্বাধিক। এ কাব্য তিন খণ্ডে বিন্যস্ত। সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন---'অন্নদামঙ্গল আসলে তিনটি পৃথক কাব্য:

১) অন্নদামঙ্গল (শিব-পার্বতীর উপাখ্যান এবং পার্বতীর অন্নপূর্ণা রূপ পরিগ্রহ ও অনশনক্লিষ্ট শিবকে অন্নদানের কাহিনী),

২) বিদ্যাসুন্দর (রোম্যান্টিক প্রণয়কাহিনী) এবং

৩) মানসিংহ (যশোরের প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের সংঘর্ষ কাহিনি)।'[৩৭]

এই তিনটি অংশে অন্নপূর্ণামঙ্গল বিভক্ত। কবির পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক অন্নপূর্ণা-পূজা প্রচলনের ইতিহাস-রূপে প্রথম অংশ রচিত। গঙ্গা-তীরবর্তী নবসমৃদ্ধসম্পন্ন জনপদের ধনী অধিবাসীদের রুচি অনুসারে দ্বিতীয় অংশটি রচিত। কৃষ্ণনগরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার কীর্তিকাহিনীর প্রচার-কল্পে তৃতীয় অংশ রচিত। তবু এইভাবে পুরাণ, রোম্যান্টিক লোকগাথা এবং ইতিহাসের সহায়তায় প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের ধারায় আবির্ভূত হয়েও কবি রচনা করেছিলেন 'নূতন মঙ্গল'। কাব্যটির তিনটি অংশ সম্পূর্ণ পৃথক মর্যাদার অধিকারী, তবু তিনটির মধ্যে কাহিনির যোগসূত্রতায় একটা আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে। হয়ত চিরায়ত দেবনির্ভরতায় মঙ্গলকাব্যের ভক্তিছত্রতলে কুণ্ঠিত যে জাতির আত্মবিশ্বাস বিলীয়মান, তাকে নতুন স্বপ্ন দেখানোর কঠিন দায়িত্বকেই সম্ভাব্য করে তোলার জন্য মঙ্গলকাব্যের পুরনো আঙ্গিকে নতুন ভাবনা প্রকাশের তাগিদ। এটা ঠিক যে রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রের বহুব্যাপ্ত জীবনাভিজ্ঞতার নির্যাস স্বরূপ যে ভোগবাদী জীবনদর্শন গড়ে উঠেছিল, অন্নদামঙ্গল কাব্যের তিনটি খণ্ডেই তার কিছুটা

ছায়াপাত ঘটেছে। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনাগরিক রাজসভার রুচিবিনোদক সভাকবি। তাই বিষয়বস্তু থেকে বহির্কাঠামো, অন্তরঙ্গ রসবোধ থেকে বহিরাঙ্গিক রুচি সবেতেই এ কাব্যে সভাকাব্যের অনিবার্য লক্ষণের প্রকাশ ঘটেছিল। সভাকাব্যের নিয়ম মেনে উঠে এসেছিল রাজপ্রশস্তি, আর সেই প্রশস্তি রচনায় উঠে এসেছিল সমকালের ছবি। বর্গি আক্রমণে বিধ্বস্ত বাংলার অবক্ষয়িত সমাজ অর্থনীতি ধরা পড়েছিল মানুষের দুরবস্থার চিত্রে। আসলে মজলিশি কাব্যের রূপকার হলেও ভারতচন্দ্র জীবন-বিমুখ ছিলেন না। রাজসভার উপযোগী অলংকৃত শৃঙ্গার পাত্রেও জীবনের স্মরগরল পরিবেশন করেছিলেন তিনি। সবচেয়ে বড় কথা, ভারতচন্দ্রের আগে যাঁরা মঙ্গলকাব্য রচনা করেছিলেন তাঁদের তুলনায় ভারতচন্দ্রের কাব্যে একটি ভিন্ন মাত্রা সংযোজিত হয়েছিল। সামাজিক অস্থিরতা মানুষের জীবনকে অনিকেত করে তুলেছিল। ভারতচন্দ্র এই অস্থির সময়কেই কাব্যে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর কাব্যে তাই গোষ্ঠী ভেঙে ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ করতে শুরু করেছিল আর ব্যক্তি-প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে দেব-দ্বিজে মানুষের ভক্তিও কমতে শুরু করেছিল। নিজের অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে কার শরণাপন্ন হবে মানুষ---সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। শিবের দেবত্বের সুবিশাল মহিমা এই কারণেই হয়ত অন্নদামঙ্গলে অবসিতপ্রায়। কবি রামেশ্বরের (সম্ভবত ১৬৭৭-১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দ) শিবায়ন কাব্যে (১৭১১ খ্রিস্টাব্দ) শিবের দৈবী খোলস ক্রমশ অনাবৃত হতে শুরু করেছিল ঠিকই, তবু একেবারে সম্ভ্রমহীন হয়ে যায়নি। কিন্তু যুগ যত এগিয়েছে রাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলা আর নৈরাজ্যের প্রকোপে মানুষের পুঞ্জীভূত তীব্র ক্ষোভ ততই দেবতাকে ব্রাত্য করে দিয়েছে। এ কাব্যেও চরিত্রেরা দেবতার পূজায় আগ্রহ না দেখিয়ে দেহ-বিলাস আর রতি-সুখে মত্ত হতেই বেশি আগ্রহী। আসলে সময়টাই এরকম। মধ্যযুগের অন্তিম পর্বে তখন সন্ধিক্ষণের উন্মাদনা আর অস্পষ্টতা। একদিকে তমসা আর অন্যদিকে ঊষার চিহ্ন-বাহী সেই ক্রম-স্ফুট সময়-বলয়ে তখন একই সঙ্গে আবর্তিত হয়ে চলেছিল অতীত ঐতিহ্য আর অনাগত ভবিষ্যতের দ্বন্দ্ব, বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলাচল। এমন এক যুগসন্ধির প্রতিনিধি কবির পক্ষে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতার ভাবসাগরে ডুবে থাকা সম্ভব নয়, যুগের চাহিদাতেই তাঁকে অন্য পথে হাঁটতে হবে। বিপন্ন দেশ, ক্রান্তিকারী সময়ের ভঙ্গুর পটে রুগ্ন, বিবর্ণ, মারী-গ্রস্ত সমাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি এক নিবিষ্ট পাঠকের মত নিখুঁত পাঠে পড়ে নিয়েছিলেন সমকালকে। ভাঙন ধরা গ্রামীণ বাংলার সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম আর রাজনীতির অন্তর্নিহিত মৌল অসত্যের বীজটি খুঁজে পাওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়নি। সেই সূত্র ধরে বর্গি হাঙ্গামা থেকে ইংরেজ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়-পর্বে উপস্থিত থেকে বাংলাদেশের সমাসন্ন ঐতিহাসিক নিয়তিকে স্পষ্ট করেছিলেন তাঁর কাব্যে। আধুনিক যুগ যে আগতপ্রায় তার নানা চিহ্ন সময়ের শরীরে ফুটে উঠছিল,

ভারতচন্দ্র তাদের চিনতে ভুল করেননি---সেই অর্থে অবশ্যই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রশংসনীয়। সেদিক থেকে তিনি আধুনিকও বটে।

দ্বি তী য় প রি চ্ছে দ

শিষ্ট নাগরিক সাহিত্যের রূপ বদল

যদিও বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত নির্দেশ করা হয় ভারতচন্দ্রের তিরোধানের (১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ) পরের সময়-পর্ব হতে। আসলে আধুনিকতা এক বিশিষ্ট মনোভঙ্গির ফসল। খণ্ডকালের নিরিখেই তার একমাত্র পরিমাপ নয়। তাই রবীন্দ্রনাথের কথা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে আধুনিকতা শুধুমাত্র 'সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে'।[৩৮] বাংলা দেশেও আধুনিক মর্জির জন্ম বলা হয়ে থাকে মূলত উনিশ শতকের নবজাগরণিক অনুপ্রেরণা থেকে। তবে এই নবজাগরণের বীজ অঙ্কুরিত হতেও অবশ্যই সময় লেগেছিল, রাতারাতি সে পরিবর্তন সম্ভব ছিল না। মুঘল রাজত্বের অবক্ষয় অতিক্রম করে ব্রিটিশ শাসনের সান্নিধ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালির জীবন নবযুগের আলোকের ছোঁয়ায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল এমনটা নয়, অনেক ক্ষেত্রেই বরং দেখা যায় মুঘল বাংলার পঙ্কিলতার স্রোতেই এদেশের আদি ব্রিটিশ শাসকেরা গা ভাসিয়েছিলেন নির্বিচারে। ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। পলাশির যুদ্ধে সিরাজের পতন ও পরাজয়ের ফলেই বাংলার যথার্থ রাষ্ট্রাধিকারে ব্রিটিশ শক্তি প্রায় তৎক্ষণাৎ প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। কিন্তু পলাশি বিজয়ের রাজনৈতিক তাৎপর্য প্রথমে সমকালীন ব্রিটিশ বণিকের কল্পনায় আসেনি। তারা এই জয়কে বঙ্গে পুনরায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠার দ্যোতক মনে করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের অঙ্গুলি হেলনে বাংলার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধীরে ধীরে ব্রিটিশ শক্তির কুক্ষিগত হচ্ছিল, বণিকের মানদণ্ড শাসকের রাজদণ্ডে পরিণত হওয়া ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে সারা বাংলার দেওয়ানি লাভ তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। দুর্গত বাংলাকে মুক্তির পথ দেখানোর অভিপ্রায় মুনাফালোভী শাসকের ছিল না, বরং তাঁরা প্রত্যেকে বাংলার সম্পদ শোষণের নতুন নতুন পথ সন্ধানেই ব্যস্ত ছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭-১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ) লেখনী তাঁদের সেই মনোভাবকে উপযুক্ত ভাবে তুলে ধরেছে :

> '...এদেশের লোকের সুখ-দুঃখের সঙ্গে, উন্নতি-অবনতির সঙ্গে, আমাদের সম্বন্ধ কি? আমরা বৈধ-অবৈধ যেরূপ উপায়েই হউক এখান হইতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া লইয়া দেশে যাইব এইমাত্র আমাদের কাজ। এই ভাব কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের মনে এবং

ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানীর সমুদয় কর্ম্মচারীর মনে বহুদিন প্রবল ছিল।'[৩৯]

তবু যে শিক্ষার সান্নিধ্যে এসে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ আত্ম-মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল তা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাহিত্যের দান একথা অস্বীকার করা যায় না। আর পাশ্চাত্য শিক্ষাকে অবলম্বন করে এই নতুন আলোড়ন মূলত ঘটেছিল কলকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে। উনিশ শতকের সমাজ-সচেতন, অনুসন্ধিৎসু, স্বাতন্ত্র্য-দীপ্ত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মিলন কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল নতুন নগর কলকাতা। কলকাতাই হয়ে উঠল আধুনিক বাংলা শিক্ষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির উৎসস্থল। এজন্য বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগকে কেউ কেউ 'কলকাতা পর্ব' হিসেবেও চিহ্নিত করেন। বস্তুত উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্পর্শে বাংলা সাহিত্যে নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এর ফলে গদ্যসাহিত্যের বিকাশ ও পরিপুষ্টি হয়েছিল এবং কাব্যের ক্ষেত্রে নতুন জীবনবোধ জেগে উঠেছিল। এর আগে পর্যন্ত বারংবার বিভিন্ন দেবদেবীর মাহাত্ম্যকথা, নানা পৌরাণিক কাব্য, পদাবলি প্রভৃতি রচিত হচ্ছিল, তার পাশাপাশি ছিল কবিগান, পাঁচালি, বাউলগান ইত্যাদি। ধর্মাশ্রিত, আধিদৈবিক, গান-বাহিত এই গতানুগতিক ধারা ছিল পুরাতনেরই অনুবর্তনকারী। নবযুগের কোনো বিশেষ লক্ষণ এগুলির মধ্যে পরিস্ফুট হয়নি সেভাবে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও এই আধুনিক ও অনাধুনিক ধারা পাশাপাশি চলছিল, কিন্তু ক্রমে প্রথম ধারার প্রবলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ধারাটি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে প্রথম ধারার সঙ্গে মিশে সাহিত্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছিল। উনিশের প্রথম দিকে যেসব পুরনো ধারার চর্চা চলছিল তার মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, পদাবলি, উপাখ্যান ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। ড. সুশীলকুমার গুপ্ত এ প্রসঙ্গে বেশ কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন 'পৃথ্বীচন্দ্রের 'গৌরীমঙ্গল' (১৮০৬-৭ খ্রিস্টাব্দ), নন্দকুমার কবিরত্নের 'কালীকৈবল্যদায়িনী' (১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ), জগমোহন মিত্রের 'মনসামঙ্গল' (১৮৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দ), দ্বিজ কালীপ্রসন্নের 'মনসামঙ্গল' (১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ), নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর 'শীতলামঙ্গল' (১৮০৯-১০ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি। এছাড়া রামকমল দত্তের 'রামায়ণ' (১৮৪২ খ্রিস্টাব্দ), রঘুনন্দন গোস্বামীর 'রামরসায়ন' (১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে।'[৪০] বিবিধ বৈষ্ণবগ্রন্থও এযুগে রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে কৃষ্ণদাসের বাংলা 'ভক্তমাল' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগেই কমলাকান্ত দাস 'পদরত্নাকর' সংকলিত করেন। এমনকি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা জন্মেজয় মিত্র সঙ্কর্ষণ ভণিতায় বেশ কিছু উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব পদ রচনা করেন। এছাড়াও অন্যান্য পৌরাণিক এবং লৌকিক বিষয় নিয়ে লেখালিখি চলছিল। পাঁচালী, কবিগান, অধ্যাত্ম ও দেহতত্ত্ববিষয়ক গীতের ধারাও

এযুগে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। এক্ষেত্রে একটা কথা অতি উল্লেখযোগ্য যে তথাকথিত অনাধুনিক ধারাটি ছিল মূলত পদ্য-বন্ধ এবং আধুনিক ধারাটি মূলত গদ্য-বন্ধ।

এই আধুনিক ধারাটিই ঊনবিংশ শতাব্দীর নবযুগের সাহিত্য। সময়ের দাবিতে তার চরিত্র বদলাচ্ছিল। সমালোচক স্বপন বসুর মতে :

> 'উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাসাহিত্য শুধুমাত্র কবি, পাঁচালি, যাত্রা, উত্তাপহীন মঙ্গলকাব্য, রাধাকৃষ্ণের খেউড়, রামায়ণ-মহাভারতের বৈশিষ্ট্যহীন অনুবাদ, আর ভারতচন্দ্রের আদিরসাত্মক কাব্যকৌতুকের অনুকরণেই সীমাবদ্ধ রইল না। তা যাত্রা করল নতুন ভাবে, নতুন পথে, তার চরিত্র হয়ে উঠল brilliant, diverse and complex...মহৎ কোনো সৃষ্টির দ্বারা উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্য চিহ্নিত না হলেও, সব দিক দিয়েই একে শক্তি সঞ্চয়ের প্রস্তুতিপর্ব বলতে পারি।'[৪১]

আসলে দেববাদের জায়গায় মানবমুখিনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং যুক্তিবাদ এ যুগের মানুষকে অনেকটাই ইহলোক-মুখী করে তুলেছিল। তারই প্রতিফলন দেখা দিচ্ছিল সাহিত্যে, গদ্য হয়ে উঠছিল তার মাধ্যম। সে ক্রমেই হয়ে উঠছিল যুক্তিতর্কের বাহন। গদ্যসাহিত্যের বিপুল উন্নতি ও কাব্যের ক্ষেত্রে নতুন জীবনবোধের বিকাশই নবযুগের মূলধারার সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। একথা বললে ভুল হবে না যে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার ভিত্তি স্থাপিত হতে পেরেছিল বাংলা গদ্যের লিখ্য রূপ প্রবর্তনের ফলে। সে প্রসঙ্গে ভূদেব চৌধুরী (১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ) জানাচ্ছেন :

> 'প্রয়োজন-নির্বাহী গদ্য ভাষাকে যুক্তি-বিচারের শৃঙ্খলা-পরম্পরিত মনন-চিন্তনের পরিবহনে নিয়োগ করার আন্তরিক আগ্রহবশেই আধুনিক 'মর্জি'র এক নূতন অভিব্যক্তি ঘটেছে সাহিত্যে। যৌক্তিকতা এবং মননধর্ম আধুনিকতার অন্যতম মৌল লক্ষণ বলেও। সেই মনন-সমৃদ্ধ মনোভাবনার বাহন রূপেই আধুনিক সৃজনশীল সাহিত্যেও গদ্য ভাষার নূতনতর ভূমিকা।....বস্তুত লিখ্য গদ্য ভাষা রচনার প্রবর্তনা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাঙালির য়ুরোপীয় সংসর্গেরই অব্যবহিত ফল।'[৪২]

যে মৌলিক প্রয়োজনকে আশ্রয় করে বাঙালির মনে গদ্য চর্চার প্রেরণা জাগ্রত হয়েছিল তার উদ্ভব কিন্তু ইউরোপীয় উদ্যম ও আগ্রহকে কেন্দ্র করেই, তাতে ভুল নেই। তাঁরা যে কেবল গদ্য রচনার পরিবেশটি সৃজন করেছিলেন তা নয়, গদ্য ভাষাটি গড়ে তোলার

জন্যে চেষ্টা করতেও ত্রুটি রাখেননি। সমালোচক সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ) জানিয়েছেন :

> 'সমুদ্রপারের সওদাগর ও পাদরিদের আগমনে কবিতাপ্রবণ বাংলাদেশে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহার ফলেই সত্যকার বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ, এবং বাঙ্গালীর আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহার পরিণতি। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইহাই সংক্ষিপ্ততম ইতিহাস।'[৪৩]

একথা ঠিক যে প্রধানত ধর্মপ্রচার এবং শিক্ষাবিস্তারের প্রেরণা গদ্যচর্চার সহায়ক হয়েছিল। সেইজন্য শতাব্দীর প্রথম পর্বে গদ্যে রচিত পুস্তক গুলির বিশেষ কোনো সাহিত্যিক মূল্য ছিল না। কিন্তু ঐতিহাসিক মূল্যের দিক থেকে বিচার করলে এর গুরুত্ব অপরিসীম। পরে ধর্ম ও পাঠ্যপুস্তকের সীমানা ছাড়িয়ে আরও নানা ক্ষেত্রে গদ্য বিকশিত হয়, সাহিত্যচর্চার অন্যতম বাহন হয়ে ওঠে। এরই পাশাপাশি বেশ কিছু সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়ে বাংলা গদ্যের বিকাশ ও প্রচারে সাহায্য করতে থাকে। মূলত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাহিত্যের স্পর্শ লাভ করে বাংলা সাহিত্য তার ধারা বদলাতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক সুকুমার সেন জানাচ্ছেন :

> 'ইংরেজী সাহিত্যের স্বাদ পাইয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী নিজের সাহিত্যের প্রতি সচেতন হয় এবং সে সাহিত্যের অপূর্ণতার সম্বন্ধে তাহার বোধ জন্মে। ইহার প্রথম প্রতিফলন ঘটিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গদ্য-পাঠ্যপুস্তক রচনায় উৎসাহে এবং সমসাময়িক পত্রিকার সাদর প্রচলনে। ইংরেজী শিক্ষার পরিমার্জনা ও তৎলব্ধ নব-মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে আধুনিকতার পথ প্রস্তুত হইতে থাকে।...ইংরেজী-সাহিত্যের স্তন্যপুষ্টি লাভ করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর কল্পনায় যে আত্মসম্মানের বিস্ফার ও দেশপ্রীতির উৎকণ্ঠা ঘটিয়াছিল তাহাই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের মনোবীজ বলিতে পারি। বাঙ্গালীর নব সাহিত্যপ্রচেষ্টার মধ্যে যে কিছু বিদেশি অনুচিকীর্ষা দেখা যায় তাহা লজ্জার কথা নয়। শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে বিদেশি সাহিত্যের রসবাহিত যে নূতনতর মূল্যবোধ জাগিয়াছিল তাহা গৌরবেরই।'[৪৪]

এর আগে পর্যন্ত সামান্য কিছু চিঠিপত্র এবং দলিল দস্তাবেজে গদ্যের নিদর্শন পাওয়া গেলেও তাতে সাহিত্যিক লালিত্যের কোনো সম্ভাবনার অঙ্কুর তখনও দেখা যায়নি। উনিশ শতকের আগে বাংলা গদ্যের যেটুকু ব্যবহার ছিল তা মূলত কিছু কড়চা জাতীয়

রচনায় এবং দলিলপত্রে। আসলে সহজ স্বাভাবিকতা এবং বাস্তব প্রয়োজন সাধনই গদ্যের মৌল ধর্ম তা অস্বীকার করার নয়। পরে তা সাহিত্যের প্রধানতম মাধ্যম হয়ে ওঠে। তবে ইংরেজদের আগে পর্তুগিজ পাদ্রিরা ছিলেন বাংলা গদ্যের বিদেশি সাধক। পর্তুগিজদের উদ্যমে রচিত বাংলা গদ্যের নির্মাণে হয়তো সেরকম পরিকল্পনা ছিল না, তবু এ বিষয়ে তাঁদের আগ্রহকে মর্যাদা দিতেই হবে। বাংলা গদ্যরূপ রচনার অবচেতন প্রস্তুতির শুরু এখান থেকেই। আসলে ধর্মপ্রচার করতে গেলে যে ভাষা-গত ব্যবধান দূর করা প্রয়োজন এটা বুঝতে তাঁদের ভুল হয়নি। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের লিসবনে তিনটি বাংলা বই রোমান হরফে মুদ্রিত হয়েছিল। যেমন 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ', 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' এবং একটি 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দকোষ' (Vocabulario em Idiomae Bengella'e Portuguez) এর কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু এসব রচনা সাধারণ লোকের কাছে পৌঁছায়নি। পর্তুগিজ ধর্মযাজকদের পরে বাংলা গদ্যের ইতিহাসে গদ্যচর্চার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিলেন ইংরেজরা। আসলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যশাসন এবং রাজস্ব আদায়ের কাজে এই দেশের ভাষা জানার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল। ইতিমধ্যেই বাংলা অক্ষর তৈরি হয়ে গিয়েছিল কোম্পানির কর্মচারী চার্লস উইলকিন্সের (১৭৫০-১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ) হাত ধরে। নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের (১৭৫১-১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ) বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থের (A Grammer of the Bengal Language) উদাহরণে বাংলা ছাপার অক্ষরের ব্যবহার দেখা গেল। দেশীয় ভাষায় অন্যান্য আইনকানুনের বই ছাপার কাজ শুরু হল। ইতিমধ্যে ইংরেজ মিশনারিরা দেশী ভাষার মাধ্যমে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের সংকল্পে ব্রতী হয়েছিলেন। ধর্মপ্রচারের সুবিধার্থে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উইলিয়ম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ), জশুয়া মার্শম্যান (১৭৬৮-১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ) এবং উইলিয়ম ওয়ার্ড (১৭৬৯-১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ)। শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনা থেকে জানা যাচ্ছে :

> 'পীতাম্বর সিং নামক কায়স্থ-জাতীয় এক ব্যক্তিকে তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তৎপরে বৎসরের পর বৎসর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যা বর্ধিত হইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণের দুই দিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক হইতে লাগিল। প্রথম খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণের ইংরাজী শিক্ষার উপায় বিধান করা, দ্বিতীয়তঃ দেশীয় ভাষাতে বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থ অনুবাদ করিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন করা। ইঁহাদের প্রযত্নে শ্রীরামপুরে উক্ত উভয় বিষয়েই

উন্নতি হইতে লাগিল এবং তাহার ফল সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।'[৪৫]

সমালোচক রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ করেছেন :

'খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করা যদিও ঐ সাহেবদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি তৎপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের দ্বারা বাঙ্গালাভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। যেরূপ চৈতন্যসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বাঙ্গালা পদ্য রচনার উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইরূপ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পাদ্‌রী সাহেবদিগের দ্বারাই বাঙ্গালা গদ্য রচনা সমধিক অনুশীলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।'[৪৬]

এই মিশনের একটি ছাপাখানা ছিল। সেখান থেকে সর্বপ্রথম ছাপা হয়েছিল নিউ টেস্টামেন্টের অন্তর্গত 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' (Gospel of St. Matthew)। তারপর পুরো নিউ টেস্টামেন্ট আর ওল্ড টেস্টামেন্টের কিছুটা এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর সমগ্র বাইবেলের অনুবাদও বেরিয়েছিল মিশনের এই ছাপাখানা থেকে। এই অনুবাদে নানাবিধ আড়ষ্টতা থাকলেও তা ছিল বাংলা গদ্য গঠনের প্রস্তুতির পর্যায়, তাই তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

শ্রীরামপুর মিশন ছাড়াও বাংলা গদ্যের বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল আর একটি প্রতিষ্ঠান, 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ'। বস্তুত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকেই উনিশ শতকের বাংলা গদ্যে নবযুগের সূচনা হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি শাসকদের মধ্যে দেশীয় ভাষা আর ঐতিহ্যের বিকাশ ঘটানো। ফোর্ট উইলিয়মের পৃষ্ঠপোষণেই বাংলা গদ্যের গঠন প্রকৃতি প্রত্যক্ষ ভাবেও অনেকটা প্রভাবিত হয়েছিল। এই কারণেও বাংলা গদ্যের গঠন এবং প্রাথমিক বিকাশের পথে এই কলেজের উদ্যমের ইতিহাস পৃথক মূল্যায়নের দাবি রাখে।

আসলে লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৬০-১৮৪২ খ্রিস্টাব্দ) ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে এসে লক্ষ্য করেন কোম্পানির শাসন চালানোর জন্য যেসব সিভিলিয়ান এদেশে আসেন, তাঁরা এদেশের ভাষা বা সংস্কৃতি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। সুশাসনের জন্য তাঁদের দেশীয় ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে ওয়েলেসলির বেশি সময় লাগেনি। তারই ফলস্বরূপ ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। এই উপলক্ষে 'গবর্নর জেনারেল' এর প্রচারিত নির্দেশ থেকে জানা যায় যে, স্বদেশ থেকে আগত সিভিলিয়ানদের এদেশের কর্মক্ষেত্রজ ভাষা ও সাহিত্যে শিক্ষিত করে তোলাই ছিল ঐ কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। 'Calcutta In the 19th century' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে Valentia-র মতামত উল্লিখিত হয়েছে :

> 'The splendid Institution established at Fort William by Marquis Wellesley, for the education of the junior European servants of the company...it is obvious that the Company is bound, by a sacred duty, to provide for the welfare of its subjects by an unremitting attention to the education of those servants, who will be appointed to the employments that can be entrusted with safety only to men of abilities, extensive information, and unsullied integrity. Nor will these qualifications alone enable them to discharge the duties which their situation imposes; they must also possess a thorough knowledge of the different languages of the natives, an intimate acquaintance with their tempers and characters, and a clear insight into their various manners, habits and customs.'[৪৭]

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে বাংলা গদ্য বেশ কিছুটা গতি লাভ করেছিল, আর তা প্রধানত সম্ভব হয়েছিল এই কলেজের বাংলা-সংস্কৃত ভাষার অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেরির অক্লান্ত চেষ্টার ফলে। কেরি ফোর্ট উইলিয়মে বাংলা ও সংস্কৃতের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে ওই বিষয়গুলির অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না, কারণ পঠনযোগ্য বাংলা বইয়ের যথেষ্ট অভাব ছিল। তাই কেরির প্রথম এবং প্রধান কাজ ছিল পাঠযোগ্য পুস্তকের ব্যবস্থা করা। কেরির আগ্রহ ও উৎসাহে অনেকগুলি বাংলা পুস্তক প্রকাশিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। স্বয়ং কেরি দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। একটি হল' কথোপকথন' (১৮০১ খ্রিস্টাব্দ) এবং অন্যটি হল 'ইতিহাসমালা' (১৮১২ খ্রিস্টাব্দ)। কথোপকথন ছিল দ্বিভাষিক এবং সংলাপের ঢঙে রচিত। ইতিহাসমালা ছিল দেড়শ গল্পের সংকলন। এই কলেজে যোগ দিয়ে কেরি সহকারী হিসেবে যেসব এদেশীয় পণ্ডিতদের পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ) এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের (১৭৬২-১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামরাম বসু 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১ খ্রিস্টাব্দ) এবং 'লিপিমালা' (১৮০২ খ্রিস্টাব্দ)

রচনা করেছিলেন এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচনা করেছিলেন 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২ খ্রিস্টাব্দ), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮ খ্রিস্টাব্দ), 'রাজাবলি' (১৮০৮ খ্রিস্টাব্দ), 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' (১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি গ্রন্থ। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত বাঙালি রচিত প্রথম মৌলিক গদ্যগ্রন্থ। লিপিমালা কিছু আদর্শ পত্ররচনার নিদর্শন। 'রাজাবলি' কলির আরম্ভ থেকে ইংরেজদের অধিকার পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' বিশ্বকোষ জাতীয় রচনা। এছাড়াও এই কলেজের লেখক-গোষ্ঠীতে আরও একাধিক গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁদের মধ্যে গোলোকনাথ শর্মা 'হিতোপদেশ' (১৮০২ খ্রিস্টাব্দ), রামকিশোর তর্কচূড়ামণি 'হিতোপদেশ' (১৮০৮ খ্রিস্টাব্দ), তারিণীচরণ মিত্র 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' (১৮০৩ খ্রিস্টাব্দ), চণ্ডীচরণ মুন্সি 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫ খ্রিস্টাব্দ), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫ খ্রিস্টাব্দ), হরপ্রসাদ রায় 'পুরুষপরীক্ষা' (১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ), কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 'পদার্থতত্ত্বকৌমুদী' (১৮২১ খ্রিস্টাব্দ), 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' (১৮২২খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি গ্রন্থ অনুবাদ এবং রচনা করেছিলেন। এঁরা যেসব গদ্য রচনা করেছিলেন তার বেশিরভাগই ছিল অনুবাদমূলক। মূলত সংস্কৃত এবং ইংরেজি থেকে এসব অনুবাদকর্ম সাধিত হয়েছিল। এই লেখকেরা নিরবচ্ছিন্ন বাংলা গদ্যের অনুশীলনে ব্যাপ্ত ছিলেন। বাংলা গদ্যের কোনো যথার্থ আদর্শ তাঁদের সামনে ছিল না। পথ ছিল একেবারেই নতুন এবং বন্ধুর। বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গেও এই ব্যবস্থার তেমন সংযোগ স্থাপিত হতে পারেনি, মৌলিক চিন্তা ভাবনার উদ্দীপনা তেমন ক্রিয়াশীল হবার সুযোগ পায়নি, এমনকি বিদেশি শাসকদের শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াসেও এই কলেজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ইতিহাসে স্বীকৃত হয়নি। তবু এত কিছু নেতিবাচকতার মধ্যেও ইতিহাসের হাতে অন্যতম মহৎ মূল্যের অধিকার সে লাভ করেছে। কারণ দেশীয় লেখকদের দ্বারা বাংলা গদ্যচর্চা একটি সুনির্দিষ্ট ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল এই কলেজের পাঠ্যপুস্তক রচনাকে কেন্দ্র করেই। মূলত অনুবাদের দিকে বেশি আলোকপাত করলেও তা বাংলা গদ্যের ভিত্তিকেই সুদৃঢ় করতে সাহায্য করেছিল। তাছাড়া উনিশ শতকের নবজাগরণ ও তার হাত ধরে ভারতীয়, বিশেষত বাংলার সংস্কৃতিতে আসতে থাকা ঔপনিবেশিক আধুনিকতা বুঝিয়ে দিতে পেরেছিল অনুবাদ কত বড় একটা মাধ্যম হতে পারে, শুধু সাহিত্যিক বা সামাজিক নয়, রাজনৈতিকও, যা দিয়ে তথাকথিত 'সভ্যতা'র প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে অবশ্য 'স্কুল বুক সোসাইটি'র কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে প্রকাশিত বইয়ের মূল্য বেশি ছিল বলে স্বল্প মূল্যে নানা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্যে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। সদস্য হিসেবে ১৬ জন ইউরোপীয় এবং ৮ জন এদেশীয় ব্যক্তি ছিলেন। বিদেশিদের

মধ্যে কেরি এবং দেশীয়দের মধ্যে তারিণীচরণ মিত্র (১৭৭২-১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ), রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৪৮-১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ), রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রমুখ ছিলেন প্রধান। এখান থেকে তারিণীচরণ মিত্র, রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন সঙ্কলিত 'নীতিকথা' (১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ), তারাচাঁদ দত্তের 'মনোরঞ্জনেতিহাস' (১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ), রামকমল সেনের 'হিতোপদেশ' (১৮২০ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছিল।

এরই পাশাপাশি ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনারি কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। সেখানেও বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ক নানা গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করা হতে থাকে। উইলিয়ম কেরির পুত্র ফেলিক্স কেরি (১৭৮৬-১৮২২ খ্রিস্টাব্দ) এবং জশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান (১৭৯৪-১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ) এ বিষয়ে সর্বাধিক উদ্যোগী ছিলেন। ক্লার্ক মার্শম্যানের 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়'ই (দ্বিতীয় সং ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ) সম্ভবত বাংলা গদ্যের প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক অনুবাদ গ্রন্থ। এছাড়া উইলিয়ম ইয়েটস এর 'পদার্থ বিদ্যাসার' (১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ) বা জন মাকের 'কিমিয়া বিদ্যার সার' (১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে গঠমানতার যুগে ভাষান্তর থেকে সার্থক অনুবাদ বিশেষভাবে নবগঠিত ভাষার পক্ষে ফলদায়ী হয়। ক্রমে বাংলা ভাষাতেই নানা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রচিত হতে শুরু করে এবং সদ্যোজাত বাংলা গদ্য আস্তে আস্তে বিবিধ ভারবহনের উপযোগী বলিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হয়ে ওঠে। এই পর্যায়ে বাংলা গদ্যে যে বিষয়-বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা সঞ্চারিত হয়েছিল তার মূলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার কথা কোনো অবস্থাতেই অস্বীকার করা যায় না।

এরপর বাংলা গদ্য তার কাঙ্ক্ষিত বিকাশ-ক্ষেত্র হিসেবে পেয়েছিল নানাবিধ সংবাদ এবং সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা। বাংলা গদ্যের সেই বিকাশ-প্রসঙ্গ ধরা পড়েছে সমালোচক ভূদেব চৌধুরীর বক্তব্যে :

> 'বাংলা লিখ্য গদ্যরীতির সূতিকাগার ছিল বিবিধ শিক্ষায়তন,
> আর তার শৈশব-কৈশোরের মুখ্য বিচরণ-ক্ষেত্র হয়েছিল বিভিন্ন
> সংবাদ এবং সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা!'[৪৮]

বস্তুত সংবাদ ও সাময়িক পত্রগুলিতেই বাংলা ভাষার সার্বিক প্রসার আর প্রতিষ্ঠা লক্ষিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। বাঙালির নবজাগ্রত নানা জিজ্ঞাসাকে ধারণ করেছিল নবজাত সাময়িক পত্রগুলি। তাই বাংলা গদ্যের ইতিহাসে সাময়িক পত্রের অন্তর্ভুক্তি অনস্বীকার্য। নচেৎ সাহিত্যের সঙ্গে সংবাদপত্রের প্রকৃতিগত ভিন্নতার কথা সকলেরই জানা।

দেশীয় ভাষায় সাময়িক পত্র প্রকাশের জন্যেও বাঙালি জাতি ইংরেজের কাছে ঋণী। বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম পত্রিকা 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে, পরিচালক ছিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারি গোষ্ঠী। এই পত্রিকার বাংলা গদ্যরীতি

যথেষ্ট প্রাঞ্জল বলেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এখানে প্রকাশিত 'আমেরিকাসন্দর্শন' থেকে একটু অংশ তুলে ধরলেই তা বোঝা যাবে :

> 'পৃথিবী চারিভাগে বিভক্ত আছে ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা। ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা এই তিন ভাগ এক মহাদ্বীপে আছে, ইহারা কোনো সমুদ্র দ্বারা পরস্পর বিভক্ত নয় কিন্তু আমেরিকা পৃথক এক দ্বীপে প্রথম দ্বীপ হইতে দু'হাজার ক্রোশ অন্তর।'[৪৯]

তবে এই পত্রিকা ছিল অনেকাংশে পাঠ্যবিষয় নির্ভর। এই সময় বাঙালির নিজস্ব উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামক একটি পত্রিকা, যার প্রাণপুরুষ ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। তবে এটি বেশিদিন চলেনি। 'দিগ্‌দর্শন'এর কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা, ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মে। প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যাচ্ছে 'এতদ্দেশীয় লোকেদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয়'[৫০] এই ছিল পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য। পণ্ডিত সুকুমার সেন বলেছেন :

> 'অনুবাদ-অনুসরণের বাহিরে স্বাধীন বাঙ্গালা রচনার পথ খুলিয়া দিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ১৮১৮ অব্দের মে মাস হইতে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় 'সমাচার-দর্পণ' প্রকাশ করিয়া।...সমাচার-দর্পণের সাফল্য বিবিধ বাঙ্গালা সাময়িক-পত্রের প্রকাশ তরান্বিত করিয়াছিল। এই সাময়িকপত্রের মধ্যে অনুশীলিত হইয়াই বাঙ্গালা গদ্যের জড়তা-মুক্তি ঘটিয়াছিল।'[৫১]

আসলে সমকালীন বাঙালি জীবনের দলিল হিসেবেও এই পত্রিকার মূল্য অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এর পৃষ্ঠায় যেমন নানা সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই এখানেই প্রকাশিত হয় 'বাবুর উপাখ্যান', 'নববাবু-বিলাস' জাতীয় রচনা। একথা বললে ভুল হবে না যে বাংলা সাহিত্যের ভাবী কালের বেশ কিছু রচনার অঙ্কুর এই দর্পণের পাতাতেই মুকুলিত হয়েছিল।

সুকুমার সেন আরো বলেছেন :

> 'বাঙ্গালায় আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে সমাচার-দর্পণ-পত্রিকার প্রকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা বিশিষ্ট দিক্‌চিহ্ন। পুথিপত্র দলিল-দস্তাবেজ তর্কাতর্কি ধর্মপ্রচার-পুস্তিকা ও পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি "কেজো" রচনার বাহিরে নিছক সাহিত্য বলিতে যাহা বোঝায় তাহার প্রথম আস্বাদ বাঙ্গালী পাঠকের কাছে প্রথমে আনিয়া দেয় সাময়িকপত্র। সমাচার-দর্পণ সংবাদ-কৌমুদী সমাচার-চন্দ্রিকা বঙ্গদূত জ্ঞানান্বেষণ সংবাদ-প্রভাকর ইত্যাদি

> সাময়িকপত্রের দ্বারাই বাঙ্গালা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচি-প্রবেশ। কিন্তু সে-সময়ে বাঙ্গালা গদ্যের রূপ অপূর্ণ এবং সৌষ্ঠববর্জিত, তাই সাময়িকপত্রের দ্বারা তখন নূতন সাহিত্যের পথ পরিষ্কার ছাড়া কিছু সম্ভব হয় নাই।'[৫২]

দর্পণের পরেই প্রকাশিত হয়েছিল 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১ খ্রিস্টাব্দ, সেপ্টেম্বর), 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই মার্চ) এবং 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১ খ্রিস্টাব্দ, ৪ঠা ডিসেম্বর)। সতীদাহ ইত্যাদি সামাজিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কৌমুদী এবং চন্দ্রিকার বাগযুদ্ধ অনেকদিন ধরে বাংলার সমাজজীবনে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। চন্দ্রিকা ছিল মূলত রক্ষণশীলদের মুখপত্র। এরপর ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ ১০ মে প্রকাশিত হয়েছিল 'বঙ্গদূত' পত্রিকা, ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ ১৮ জুন প্রকাশিত হয়েছিল 'জ্ঞানান্বেষণ'। প্রতিটি সংবাদপত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কেবল এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে মান্য নাগরিক সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে পত্রিকাগুলির অবদান কম ছিল না। বাংলার সমাজ, শিক্ষা, নৈতিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি নানা বিষয়ে শিক্ষিত বাঙালির ভাবনা ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছিল, আর আলোচ্য সংবাদপত্রগুলি তাদের সর্বাত্মক জীবন-জিজ্ঞাসার পথকে অবারিত করে দিয়েছিল। এই পর্বের সংবাদপত্রের প্রধান প্রচেষ্টা ছিল জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে অনাগত যুগের সার্থক প্রস্তুতি রচনা করা। সমালোচক ভূদেব চৌধুরীর মতে :

> 'এই প্রস্তুতির সফলতম নিদর্শন 'গুপ্ত কবি' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) 'সংবাদ প্রভাকর'। প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে 'বারত্রয়িক', তার পরে দৈনিক রূপে 'সংবাদ প্রভাকর' বাংলার বিকাশশীল সাহিত্য-সংস্কৃতির ওপরে প্রভাকর-কিরণ বর্ষণ করেছিল।...লুপ্ত-প্রায় প্রাচীন বাংলা কাব্য-কবিতার সন্ধান এই 'সংবাদ-প্রভাকরে'র পৃষ্ঠাতেই সূচিত করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত; এখানেই বাংলা-সাহিত্যের ঐতিহাসিক পরিচায়ন-চেষ্টারও অঙ্কুরোদগম। এখানেই নিত্যনূতন করে সংকলিত কবিগান ও কবিওয়ালাদের পরিচায়ন, ভারতচন্দ্রের জীবন-বৃত্তান্তের প্রকাশ, তথা কাব্য-কবিতার বলিষ্ঠ বিচারও প্রথম সূচিত হয়েছিল। 'প্রভাকর'কে কেন্দ্র করেই আবার রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিকৃতির বিকাশ;...'সংবাদ-প্রভাকরে'র পৃষ্ঠাতেই বঙ্কিমচন্দ্র-দীনবন্ধুর কৈশোর-দীপ্ত কবিতা-বিতর্কের প্রথম অভিব্যক্তির পথ অবারিত হয়েছিল।'[৫৩]

'সংবাদ প্রভাকর'-এর আরেকটি বিশেষ অবদান হল বাঙালি জীবনে স্বাজাত্যবোধের প্রেরণা সঞ্চার। বাঙালির স্বাভিমান এবং স্বজাতি প্রেমের বিকাশে এই পত্রিকার ভূমিকাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এই যুগ থেকেই বাঙালির চেতনায় জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছিল। সব মিলে একথা বলা যেতেই পারে যে আধুনিক শিক্ষিত বিদগ্ধ বাঙালির চেতনার বাহন হিসেবে সমকালের সংবাদপত্রগুলির গুরুত্ব ছিল অসীম। তারাই ছিল নবোদ্ভিন্ন বাংলা গদ্য-রূপের ধাত্রী। মনন আর স্বাধীন চিন্তার ব্যাপক পটভূমি গড়ে উঠেছিল এখানে। এর মাধ্যমেই লৈখিক গদ্যের উপযুক্ত গঠন সাধিত হয়েছিল। এরপর ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ) সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে সাময়িকপত্রের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। এই পত্রিকা সম্বন্ধে মনিয়ের উইলিয়ম (১৮১৯-১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ) লিখেছেন :

> 'It had its organ in a monthly periodical, called the Tattvabodhini patrika. This journal was started in August, 1843, and was well edited by Akhay Kumar Datta, an earnest member of the theistic party. Its first aim seems to have been the dissemination of Vedantic doctrine, though its editor had no belief in the infallibility of the Veda, and was himself in favour of the widest catholicity. He afterwards converted Debendranath to his own views.'[৫৪]

এখানে বিজ্ঞান, অধ্যাত্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বাংলা গদ্যে আরো দৃঢ়তা আর স্পষ্টতা এনে দিয়েছিল। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে প্রভাকরের মতই একটি শক্তিশালী লেখক-গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন চিন্তাশীল লেখকের রচনায় পুষ্ট এই পত্রিকা সাময়িকপত্রের যে আদর্শ স্থাপন করেছিল তাই পরবর্তীতে নানা সাময়িকপত্রের দ্বারা অনুসৃত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে সাময়িক পত্রের ঐতিহাসিক সার্থকতা নির্দেশ করে সুকুমার সেন তাই যথার্থই বলেছিলেন :

> '১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় আজ অবধি দেখিতেছি যে বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য (এবং বাঙ্গালা আধুনিক সাহিত্য) প্রধানতঃ সাময়িক পত্রিকার আশ্রয়েই বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালা গদ্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের বাহন হইয়াই সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাসিক

> পত্রিকা, সোমপ্রকাশ, বঙ্গদর্শন, ভারতী, জ্ঞানাঙ্কুর, আর্যদর্শন, বান্ধব, নবজীবন, সাধনা, প্রবাসী, ভারতবর্ষ ও সবুজপত্র ইত্যাদির নাম বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়াছে।'[৫৫]

এ পর্যন্ত বাংলা গদ্যের আলোচনায় ক্রমশ নাগরিক বাঙালির আত্মোন্নতির একটি প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। তারা নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে জ্ঞানের নানা বীজ সংগ্রহ করেছে, সংবাদ ও সাময়িকপত্র তাদের মুক্ত চিন্তার পথকে অবারিত করেছে। এবার ব্যক্তিস্বাধীনতার উন্মোচনের পাশাপাশি জীবনের দাবি হয়ে উঠেছে ব্যক্তিত্বের মুক্তি। লক্ষিত হয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকারের প্রবণতা। ভূদেব চৌধুরীর কথায় :

> 'ব্যক্তিত্বের স্পর্শে চিহ্নিত হতে পারলেই ব্যবহারসাধক গদ্য আসলে সাহিত্যের মর্যাদা দাবি করতে থাকে। স্রষ্টার জীবন-স্পর্শই আসলে সৃষ্টির সার্থক উৎস।'[৫৬]

সেদিক থেকে দেখতে গেলে রামমোহন রায়ের (১৭৭২ মতান্তরে ১৭৭৪-১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ) হাতেই বাংলা গদ্যরীতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন :

> 'গীর্জা ও পাঠশালার বাহিরে আনিয়া, বিচার-বিশ্লেষণে উচ্চতর চিন্তার বাহন হিসাবে প্রথম ব্যবহারে লাগাইয়া বাঙ্গালা গদ্যকে জাতে তুলিলেন আধুনিক কালের পুরোভূমিকায় সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মনীষী রামমোহন রায়।'[৫৭]

তাঁর কাছে বক্তব্য-বিষয় স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পদ্য যথেষ্ট বলে মনে হয়নি। তাই তিনি যুক্তি ও বিবৃতির ভাষার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। তাঁর প্রথম বাংলা রচনা 'বেদান্তগ্রন্থ' প্রকাশিত হয় ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে। এরপর তিনি অজস্র মৌলিক এবং অনুবাদমূলক পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন। তার মধ্যে 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ), 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' (১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ), 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ), 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০ খ্রিস্টাব্দ), 'সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রীর সহিত বিচার' (১৮২০ খ্রিস্টাব্দ), 'গুরুপাদুকা' (১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ), 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' (১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ), 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। একথা ঠিক যে তিনি ধর্মসংস্কার আর সমাজচেতনার উদ্দেশ্য নিয়েই কলম তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর গদ্য ছিল একান্ত প্রয়োজন-ভিত্তিক। বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। তাই তাঁর গঠিত গদ্যে মাধুর্যের পরিমাণ কম হলেও তাতে স্পষ্টতা আর কার্যোপযোগিতা ছিল। সে সময়ের কলেজী রচনার সঙ্গে

মিলিয়ে পড়লে সে ভাষার স্পষ্টতা বোঝা যাবে। তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যকে অনুবাদ, আলোচনা, বিতর্ক ও মীমাংসার বাহন করে তুলেছিলেন। তাঁর গদ্য তাই ঋজু-গতি এবং যৌক্তিক পারম্পর্যে সুগঠিত। তবে অতিমাত্রায় উদ্দেশ্যমূলক বলে এসব গদ্যের মধ্যে যথার্থ সাহিত্য-রূপ প্রকাশ পায়নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তর-তিরিশে বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠায় যাঁদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দ), কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ) প্রমুখ। তার মধ্যে স্মরণীয়তম হলেন ঈশ্বরচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় তিনিই বাংলা গদ্যের :

> 'প্রথম যথার্থ শিল্পী। তৎপূর্বে বাঙ্গলায় গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু তিনিই বাঙ্গলা গদ্যে প্রথম কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।'[৫৮]

'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' থেকে জানা যাচ্ছে :

> 'বাংলা গদ্য সাহিত্যে প্রথম শিল্প-বোধসম্পন্ন স্রষ্টা ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।...বাংলা গদ্যের শিল্পী হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সাক্ষাৎ বংশধর। মাঝখানে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা উপকরণ সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছিলেন; বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, সাময়িক সংবাদ প্রচার প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে বাংলা ভাষার নানা সম্ভাবনা তাঁহাদের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং সকল পরীক্ষার ফলে ভাষা এমন একটা নমনীয়তা লাভ করিয়াছিল, যাহা মৃত্যুঞ্জয়ের আমলে ছিল না। বিদ্যাসাগর এই নমনীয় উপাদান লইয়া সত্যকার শিল্প সৃষ্টি করিলেন, তিনিই বাংলা গদ্য সাহিত্যে প্রথম কৃতী শিল্পী।'[৫৯]

পরিমিতি ও লালিত্য সঞ্চার করে তিনি বাংলা গদ্যকে সজীব করে তুলেছিলেন। বিরতি চিহ্নের ব্যবহারের কুশলতার দিক থেকেও তিনি বাংলা গদ্যের গঠনে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিলেন। প্রথমে তিনি অনুবাদের দিকেই মনোনিবেশ করেছিলেন, পরে মৌলিক রচনাতেও নিজের প্রতিভার পরিচয় দেন। তাঁর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ), 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ), 'জীবনচরিত' (১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ), 'বোধোদয়' (১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ), 'শকুন্তলা' (১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ), 'বর্ণপরিচয়' (১৮৫৫

খ্রিস্টাব্দ), 'কথামালা' (১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ), 'চরিতাবলী' (১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ), 'আখ্যানমঞ্জরী' (১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ), 'সীতার বনবাস' (১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ), 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি বেশিরভাগ অনুবাদমূলক হলেও বেশ কিছু স্বাধীন রচনার সন্ধানও মেলে। যেমন 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ), 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি। অনুবাদের ক্ষেত্রেও সংগৃহীত বিষয়কে স্বাধীনভাবে নিজের কল্পনা শক্তির দ্বারা পুনর্গঠিত করতেন তিনি। সুকুমার সেনের মতে :

> 'বিদ্যাসাগরের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি প্রচলিত ফোর্ট-উইলিয়মি পাঠ্যপুস্তকের বিভাষা, রামমোহন রায়ের পণ্ডিতি ভাষা এবং সমসাময়িক সংবাদপত্রের অপভাষা কোনটিকেই একান্তভাবে অবলম্বন না করিয়া তাহা হইতে যথাযোগ্য গ্রহণবর্জন করিয়া সাহিত্যযোগ্য লালিত্যময় সুডৌল যে গদ্যরীতি চালাইয়া দিলেন তাহা সাহিত্যের ও সংসারকার্যের সব রকম প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হইল।'[৬০]

গদ্যে সংস্কৃত-প্রধান সাধুরীতির পোষকতা করলেও মানতেই হবে সে ভাষা জীবন-সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ছিল না।

তবে বিদ্যাসাগর ছাড়াও সেই পর্বের বাংলা গদ্যের ইতিহাসকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছিলেন মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত। প্রবল জ্ঞানানুরাগ ছিল তাঁর জীবনের চালিকাশক্তি। তাঁর ভাষার সৌষ্ঠবও কালের প্রশংসা লাভ করেছে। তিনি পাঠ্যপুস্তকই রচনা করেছিলেন বেশি। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (প্রথম ভাগ ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ), 'চারুপাঠ' (১৮৫৩-৫৯ খ্রিস্টাব্দ), 'ধর্মনীতি' (১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ), 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (দু খণ্ড, ১৮৭০ ও ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'চারুপাঠ' সম্বন্ধে রামগতি ন্যায়রত্ন জানিয়েছিলেন :

> 'ইহার পূর্বে বিশ্বের নিয়ম ও বাস্তবপদার্থসংক্রান্ত এরূপ মনোহর ও জ্ঞানপ্রদ বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় নাই।...তাঁহার রচনা যেমন সরল, তেমনই মধুর, তেমনই বিশুদ্ধ ও তেমনই জ্ঞানপ্রদ। তিনি অতি দুরূহ বিষয় সকলও চিত্রপ্রদর্শনপূর্ব্বক এমন সরল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন যে, পাঠমাত্র সে সকল পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায়।'[৬১]

আর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' হোরেস হেম্যান উইলসনের 'Essays and Lectures on the Religion of the Hindus' অবলম্বনে রচিত হলেও তাতে

অক্ষয়কুমার অনেক কিছু নতুন বস্তু সংযোজন করেছিলেন। তিনি রসস্রষ্টা সাহিত্যিক না হলেও তাঁর রচনায় প্রসাদগুণের অভাব ছিল না। নবগঠিত বাংলা গদ্য তাঁর হাতে এক নতুন পরিণতির দিগন্তরেখা আবিষ্কার করতে চেয়েছিল।

এছাড়াও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্ষয় কীর্তি 'বিদ্যাকল্পদ্রুম', কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ', তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী' উনিশ শতকের বাংলা গদ্যে অভিনব সংযোজন হিসেবে গণ্য হতে পারে। তারই সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গদ্যের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। রাজনারায়ণ বসু জানাচ্ছেন :

> 'দেবেন্দ্রবাবু ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট উক্ত ব্যাখ্যান প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন নিমিত্ত এবং অন্যান্য কারণ জন্য কতই উপকৃত বলা যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন আপনার প্রণীত বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থ দ্বারা বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন, দেবেন্দ্রবাবুও সেই এক সময়েই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ ও সংশোধন দ্বারা সেই উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন।'[৬২]

তাঁর প্রাথমিক রচনাগুলি মুখ্যত ধর্মবিষয়ক হলেও তার ধর্মনিরপেক্ষ শিল্পগুণ বিচার করলে তার মধ্যেও সাহিত্যগুণ খুঁজে পাওয়া দুর্লভ নয়। সুকুমার সেন অবশ্য জানাচ্ছেন :

> 'ঋষি দেবেন্দ্রনাথের অন্তরে যে একটি সাহিত্যিক বাস করিত সে দ্বিজেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকুলগুরু। দেবেন্দ্রনাথের এই সাহিত্যিক-স্বরূপের পরিচয় তাঁহার প্রকাশিত আনুষ্ঠানিক রচনায় নাই, আছে অন্তরঙ্গ-সুহৃদ-আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে লেখা পত্রাবলীতে। এই পত্রাবলীতে এবং তাঁহার স্বরচিত জীবনচরিতে দেখিতে পাই যে অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগরের সমান্তরালে দেবেন্দ্রনাথ অজ্ঞাতসারে বাঙ্গালা গদ্যের একটি নিজস্ব সরল স্টাইল নির্মাণ করিতেছেন।'[৬৩]

তাঁর বক্তৃতার সংকলন 'ব্রাহ্মধর্ম' (১৮৫১, ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ), 'ব্রাহ্মধর্মের বক্তৃতা' (১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি পরে পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এমনকি তাঁর আত্মজীবনী পড়লেও তাঁর কলমের মুনশিয়ানা অনুভূত হয়। এ যুগেরই আরেক স্মরণীয় গদ্য লেখক ছিলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম সচিত্র মাসিকপত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ) এর সম্পাদক। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিদ্বান এবং জ্ঞানী পুরুষ। তাঁর উৎকৃষ্ট লেখাগুলি 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' এবং 'রহস্য সন্দর্ভ'

নামক মাসিক পত্রিকা দুটিতে ছড়িয়ে আছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন :

> 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা-এ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনেক বড় বড় সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারো নয়।'[৬৪]

একথা বললে ভুল হবে না যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলালের মনন চিন্তনে পুষ্ট সমৃদ্ধির উত্তর-ভূমিতে বাংলা গদ্য ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। রাজনারায়ণ বসু এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে উনিশ শতকের প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা পরিণততর হয়ে উঠেছে। মন্ময় আবেগাত্মক রচনাই হোক বা গুরুগম্ভীর মননশীল রচনা---সবেতেই রাজনারায়ণের লেখনী সার্থক তন্নিষ্ঠতার অনুশীলন করেছে। তাঁর প্রসিদ্ধ রচনাগুলির মধ্যে 'রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা' (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৫৫, ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ), 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ), 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনার মধ্যে 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ), 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদির কথা বলা যেতে পারে। তাঁর রচনার নানামুখী বৈচিত্র্য বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর মধ্যে অতীত ঐতিহ্যের দৃঢ় ভিত্তির সন্ধান মেলে। তবে সমকালকেও তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। যুগধর্মের শিক্ষা তাঁর মধ্যে ব্যর্থ হয়নি। তাঁর রচিত সামাজিক প্রবন্ধ সমকালের জাতীয়তাবোধকে পরোক্ষভাবে জাগাতে সাহায্য করেছিল বলেও অনেক সমালোচক মনে করেছেন। তবে ইংরেজ শাসনের অবসান তিনি চাননি। তাঁর মূল প্রতিপাদ্য জাতীয়ভাব বৃদ্ধি ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্তব্য নির্ণয় করা হলেও তিনি একাধিক স্থানে সুস্পষ্ট জানিয়েছেন :

> 'আমাদের মনে জাতীয় ভাবের উদ্রেকে আমরা রাজবিদ্রোহ করিতে চাই না। আমরা বেশী করিয়া ইংরাজী শিখি, বেশী করিয়া সংস্কৃতের সমাদর করি, কাজ কর্ম্ম এমন যত্ন এবং শ্রম সহকারে নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করি, যাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষেরাও আমাদিগের দ্বারা পরাস্ত হয়েন।'[৬৫]

আসলে জাতীয়ভাব এবং রাজভক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ ভূদেবের চোখে পড়েনি। বরং ইংরেজ শাসনের সুফল স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন :

> 'ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছেন, ইহার সুশাসন করিতেছেন, ইহাকে মিলাইয়া তুলিয়াছেন, ইহাকে সম্মিলিত

রাখিতেছেন। অতএব ইংলণ্ড আমাদের গৌরবের, কৃতজ্ঞতার, সম্মানের এবং প্রেমের পাত্র হইয়াছেন।'[৬৬]

বলাই বাহুল্য উনিশ শতকে অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালি এই মতই পোষণ করতেন।

মনে রাখতে হবে উনিশ শতক পরস্পর বিরোধী আদর্শ ও সংঘাতে দ্বন্দ্বমুখর। এই যুগে বারংবার নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে এবং সচেতন সামাজিকের ভাবনায় অভিঘাত সৃষ্টি করে তা যুগোচিত সমাধানের পথ খুঁজেছে। এই পর্বের যাবতীয় ঘটনা পরম্পরা বাঙালির জীবন ইতিহাসে ছিল বিশেষ অর্থবহ। এই উপলক্ষেই নবজাগ্রত বাঙালি অনুভব করেছিল নতুন দিগন্ত খুঁজে পাওয়ার আনন্দ। ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের মুহূর্তে বাঙালি গ্রহীতারা প্রবলভাবে অভিভূত হয়েছিলেন। সাহিত্যের এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়েছিল সমুদ্রগামী জলোচ্ছ্বাস। উনিশ শতকের প্রথম দশকগুলিতে মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা খুব একটা বেশি ছিল না, বেশিরভাগই ছিল অনুবাদ বা সংকলন। আসলে উনিশ শতকের বঙ্গীয় সারস্বত সাধকেরা পাশ্চাত্য সাহিত্য-চেতনার সঞ্জীবনী স্রোত তখনকার তৃষ্ণার্ত বাংলা সাহিত্যের খাতে বইয়ে দিয়েছিলেন। এর পরিণতি কতটা সুফল দিয়েছিল সময় তা বিচার করেছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের আদর্শে বাঙালির সাহিত্যজীবনে নতুন জোয়ার এসেছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য অভিনবত্ব এবং বৈচিত্র্য উভয় দিক থেকেই চমকপ্রদ। তা পুরনো যুগের তথাকথিত পুচ্ছগ্রাহিতা থেকে মুক্তির স্বাদ এনে দিয়েছিল। মূলত পাশ্চাত্যের নানাবিধ সাহিত্য-শাখার অনুপ্রেরণায় বাংলা সাহিত্যেও মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য, গীতিকাব্য, খণ্ড-কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ইত্যাদির জন্ম তরান্বিত হয়েছিল। সাহিত্য-বিচারেও তা স্বতন্ত্র মূল্যবোধের জন্ম দিল। তখন থেকেই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণির মধ্যে এই জাতীয় সাহিত্যের চর্চা শুরু হল। তাদের দ্বারা সৃষ্ট ও আস্বাদিত হতে লাগল সাহিত্যের এই নানাবিধ শাখার নতুন ফসল। এই ধারাই হয়ে উঠল নবজাগরণের আলোক-পুষ্ট এবং পাশ্চাত্যের ভাবধারায় স্নাত নতুন শিষ্ট নাগরিক সংস্কৃতির অভিজ্ঞান।

তৃ তী য় প রি চ্ছে দ

শিষ্ট সাহিত্যে নতুন ফসল

কাব্যধারা

উনিশ শতকের প্রথম পর্বে সাময়িক পত্র বাংলা সাহিত্যে খোলা হাওয়া এনে দিয়েছিল। তাকে আশ্রয় করেই বাংলা গদ্য নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছিল। সুকুমার সেন জানাচ্ছেন :

> 'সেই সঙ্গে বাঙ্গালা পদ্যও নূতন পথের ইশারা পাইল। যাঁহার রচনায় এই ইশারা জাগিয়াছিল তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯)। এ ইশারা কালের ইঙ্গিত। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এ ইশারা অনুসরণ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তাই তিনি নূতন কবিতার পথ নির্দেশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু পুরানো কবিতার পুনরাবৃত্তিতে যে নূতন কবিতার রঙ ধরিলেও রস জাগিতে পারে না তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন।'[৬৭]

ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীনকে বিদায় দিয়ে সম্পূর্ণ নতুনের আবাহন করেছিলেন এমন নয়, তাঁর রচনা সন্ধি-যুগের অগ্নিবীণা এমনও নয়, কিন্তু প্রাচীন এবং নবীন এই দুই যুগকে তিনি একসঙ্গে ধরতে চেয়েছিলেন---এখানেই তাঁর অনন্যতা নিহিত। আসলে প্রত্যেকটি সার্থক কবিতার উৎস রচয়িতার ভাব-তন্ময়তার নিভৃত প্রেরণা। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমার্ধে দ্বন্দ্বমুখর নাগরিক বাঙালির জীবনে সেই নিভৃতির যথেষ্ট অবকাশ ছিল না। নতুন ও পুরনোর সংঘাতে যে ঢেউ উঠেছিল তাতে উদ্যম, সংগ্রাম বা উদ্দীপনা থাকলেও প্রত্যাশিত সংসক্তির অভাব ছিল। যদি কবি-মানস জাগ্রত হয়েও থাকে, কাব্যের জীবন-ভূমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল না। এ প্রসঙ্গে সমালোচক রমেশচন্দ্র দত্ত জানিয়েছেন :

> 'No renowned poet appeared in Bengal in the first half of the present century, and Iswar Chandra (Gupta) was the reigning king of the literary world in his day.'[৬৮]

তবে মনে রাখতে হবে ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন রীতিমতো বলিষ্ঠ সাংবাদিক, কিন্তু কবি হিসেবে দুর্বল। স্বভাবত তিনি যে পরিমাণে প্রাচীন কবিওয়ালাদের উত্তরসূরি, সে অনুপাতে মধুসূদন প্রমুখের যুগের পূর্বসূরিত্বের দাবিদার নন।

এরপরেই মঞ্চে আবির্ভূত হন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ)। বলা যেতে পারে বাংলা কাব্য-রঙ্গমঞ্চে মধুসূদনের প্রবেশের আগে রঙ্গলাল নান্দীপাঠ করেছিলেন। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কাব্যের বিষয়বস্তু কর্নেল জেমস টডের 'Annals and Antiquities of Rajasthan' থেকে গৃহীত। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস এখানে দেখা দিয়েছিল। বস্তুত ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে বীটন সোসাইটিতে পঠিত 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ'তে বাংলা ভাষার অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রঙ্গলালের যে আস্থা তথ্য দ্বারা সমর্থিত ছিল, 'পদ্মিনী উপাখ্যান' যেন তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ রূপে উপস্থিত। এই কাব্যের বিষয় নির্বাচনে কবির ঐতিহ্য-সচেতনতা এবং

প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধা যেমন ফুটে উঠেছে তেমনই স্বদেশীয়দের মধ্যেও তিনি সেই গরিমার বোধ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তবে এটাও খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে সেকালের ইংরেজি শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির চেতনায় রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার গ্লানিবোধ প্রত্যক্ষ ছিল না। স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যাভিমানের আবেগ থাকলেও রঙ্গলালদের যুগে ইংরেজি শিক্ষিতের জাতি-চেতনা হিন্দু জাতীয়তাবোধের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের চোখে যবনরাই ছিল শত্রু। ইংরেজ অধীনতাকে পরাধীনতা বলে তারা কখনোই ভাবেনি। এই যুগ ভারতের পরাধীনতার কাল বিবেচনা করেছিল ভারতে মুসলিম আক্রমণের সময় থেকে। আর তা থেকে মুক্তির পথ দেখতে পেয়েছিল ইংরেজ অধিকার প্রবর্তনের মধ্যে। তাই পদ্মিনী উপাখ্যানের শেষে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

'ভারতের ভাগ্য জোর দুঃখ বিভাবরী ভোর,
ঘুমঘোর থাকিবে কি আর?
ইংরাজের কৃপা বলে মানস উদয়াচলে
জ্ঞান ভানু প্রভায় প্রচার।।'[৬৯]

অবশ্য পদ্মিনী উপাখ্যানে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষায় মহা-সংগ্রামের চিত্রাঙ্কনের থেকেও বেশি গুরুত্ব পেয়েছে পদ্মিনীর রোমান্টিক প্রণয় ও সতীত্বের মহৎ আদর্শ। তাই ভীমসিংহের বীরত্ব নয়, পদ্মিনীর সতীত্ব-মহিমাই এ কাব্যকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। আর এর মূলে আছে উনিশ শতকের ভাবাবেগ-পুষ্ট বাঙালি মানস। তাই আধুনিক বাংলা কাব্যে বয়ঃসন্ধির বার্তাবহ অবশ্যই রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান'। সমকালে তা যে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল তা সমালোচক রামগতি ন্যায়রত্নের বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট :

> 'পদ্মিনী উপাখ্যান যে বিশুদ্ধ প্রণালীতে রচিত একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।'[৭০]

এরপর রচিত হয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'কর্মদেবী' (১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ), তৃতীয় কাব্য 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ), চতুর্থ কাব্য 'কাঞ্চীকাবেরী' (১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি। কর্মদেবী এবং শূরসুন্দরীর কাহিনি সূত্রও রাজপুত ইতিহাস থেকে সংগৃহীত। নারীর আত্মত্যাগ, সতীত্ব এবং শৌর্যগাথাই হয়ে উঠেছে এসব কাব্যের মূল। ভূদেব চৌধুরী জানাচ্ছেন :

> 'রঙ্গলাল উনিশ শতকের উদীয়মান বাঙালি জীবনধর্মকে পাণ্ডিত্যের দ্বারা আয়ত্ত করেছিলেন। সেই জ্ঞানলব্ধ পরিচয়কে তিনি ছন্দোবদ্ধ করে গেছেন তাঁর নানা কাব্য কবিতায়। তাই আলোচ্য যুগের প্রাণ-প্রবাহে হিল্লোলিত-চেতন সার্থক কবি নন তিনি; স্থিতপ্রাজ্ঞ জীবন-দ্রষ্টা।...রঙ্গলালের দেখানো পথ বেয়েই

আধুনিক কাব্য-সরস্বতী মধুসূদনের হাতে ধরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন।'[৭১]

এরপর বাংলা কাব্যের অঙ্গনে আবির্ভূত হন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন :

> 'আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্য শুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনিই প্রথমে ভাঙনের এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার উপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে নয়, ধীরে ধীরে নয়। পূর্বকার ধারাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে তিনি এক মুহূর্তেই নূতন পন্থা নিয়েছিলেন। এ যেন এক ভূমিকম্পে একটা ডাঙা উঠে পড়ল জলের ভিতর থেকে।'[৭২]

সুকুমার সেন মধুসূদন-প্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন :

> 'আত্মসচেতনতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) প্রতিভার গুণ ও দোষ দুইই। একদিকে যেমন ইহা তাঁহার রচনায় প্রবলতা দিয়া কাব্যে নবীনতার পথ বাঁধিয়া দিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি তাঁহার কবিবুদ্ধিকে অনুশীলনের পথে অমনোযোগী করিয়াছিল।'[৭৩]

মধুসূদন সম্পর্কে এ মূল্যায়ন যথার্থ। জীবনের প্রথম পর্বে ইংরজিতে কাব্য লিখে যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করলেও নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি বঙ্গ-সরস্বতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বাকিটা ইতিহাস। তাঁর হাত ধরেই বাংলা কাব্য জগতে একে একে ফুটে উঠল 'তিলোত্তমাসম্ভব' (১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ), 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ), 'ব্রজাঙ্গনা' (১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ), 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ) এর মত কাব্যকুসুম। বিশ্বসাহিত্যের বিশেষত ইউরোপীয় সাহিত্যের বিখ্যাত কবিদের রচনার রসাস্বাদন করেই তিনি কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন কিন্তু তাঁর কাব্যের গভীরে ভারতীয় ভাবনার নিবিড় স্পর্শ দুর্লভ নয়। যতই তিনি বলুন গ্রিক পুরাণের অপূর্ব মহিমাকে মাতৃভাষায় আমদানি করাই তাঁর উদ্দেশ্য তবু তাকে উপলক্ষ করেও তাঁর কবি-স্বভাব ভারতীয় ঐতিহ্যকেই বরণ করে নেয়। ব্যক্তিজীবনে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেও তাঁর সৃজনী ধর্ম প্রাচীন উত্তরাধিকারের শিকড়কে উপেক্ষা করতে পারে না। তখন তিনিই বলে ওঠেন :

> 'I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. A fellow with an

> inventive head can manufacture the most beautiful things out of it.'[৭৪]

আসলে পৃথিবীর প্রধান ভাষা ও সাহিত্যগুলির রত্নভাণ্ডার তাঁর সামনে উন্মুক্ত হলেও দেশীয় পুরাণ ও মহাকাব্য, বিশেষত রামায়ণ আর মহাভারতের কথা তিনি ভুলতে পারেননি, বরং বলা যেতে পারে এর বীজ শৈশবেই মাতা জাহ্নবী দেবীর প্রেরণায় তাঁর হৃদয়-ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়েছিল। বাংলা কাব্যে তিনিই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনে বাংলা ছন্দে নতুন দিগন্ত খুলে দেন। মিলটনের Blank Verseকে উপলক্ষ করে এর জন্ম হলেও সুকুমার সেন জানিয়েছেন 'এই ছন্দ বিদেশি প্রভাবজাত হলেও বিদেশি ছন্দ নয়, আসলে তা পয়ারেরই রূপভেদ।'[৭৫] তিলোত্তমাসম্ভব বর্ণনাময় ও ভাবপ্রধান কাব্য। এই কাব্য দিয়ে মধুসূদনের কাব্যজগতে যাত্রা শুরু হলেও তাঁর সার্থক কবি-কীর্তি অবশ্যই 'মেঘনাদবধ কাব্য'। এর প্রারম্ভে আছে হোমারের প্রত্যক্ষ প্রণোদনা। রাজনারায়ণকে চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন :

> '...if the father of our Poetry had given Ram human companions, I could have made a regular Iliad of the death of Meghnad.'[৭৬]

এই কাব্য রচনার শুরুতে কবির অভিপ্রায় ছিল 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত।'[৭৭] কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও 'মেঘনাদবধ কাব্য' বীররসের কাব্য হয়নি। করুণ রসের উৎসার কাব্যের অভিমুখ বদলে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা রাবণ এবং মেঘনাদ মধুসূদনের চোখে Grand এবং Noble fellow. তারা বিধির দ্বারা বিপর্যস্ত চরিত্র। এই কাব্যে বাল্মীকির পুরা-কথার সূত্র ধরে মধুসূদন আসলে উনিশ শতকের নাগরিক বাংলার রেনেসাঁসের নতুন মূল্যবোধকে উৎসারিত করার সাধনা করে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাব্যের আলোচনা করে 'Calcutta Review' তে লিখেছিলেন :

> 'To Homar and Milton as well as Valmiki, he is indebted in many ways. But he [মধুসূদন] has assimilated and made his own most of the ideas which he has taken.'[৭৮]

এই assimilation,_রবীন্দ্রনাথের ভাষায় স্বীকরণ মেঘনাদবধ কাব্যের বিশ্বচারী ভাব-কল্পনা ও রূপকল্পকে বাঙালি জীবনধর্মের মূলে প্রোথিত করেছে। এই কাব্যে চরিত্রদের শূরধর্মের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ধর্মও প্রাধান্য পেয়েছে। নীরক্ত বীরত্ব নয়, সম্পর্কের উষ্ণতাকে লালন করে তারা হয়ে উঠেছে মানবিক। এই সময় মানুষ আবিষ্কার করেছিল মনুষ্যত্বের অপরিমেয় শক্তি, যা মূলত যুগের দান। সেই শক্তিরই যেন প্রতিভূ হয়ে উঠেছে এই কাব্যের রাবণ। কাহিনির শেষে রাবণকে পাওয়া যায় এক উন্মূলিত

মহীরুহের মত, শোকগ্রস্ত, বিহ্বল, পরাস্ত। কিন্তু তবুও প্রকৃত গৌরবের অধিকারী এখানে সে-ই। কারণ সে পরাজিত হয়েও পরাভব মানতে চায়নি, শক্তিহীনতার দুর্বলতাকে স্বীকার করেনি। রাবণের এই দুঃসাহসী ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিণত বয়সের 'মেঘনাদবধ কাব্য'র সমালোচনায় :

> 'এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে। তবু যে অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মধ্যে বসিয়াও কোনো মতেই হার মানিতে চাহিতেছে না,- কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরে শ্মশানে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন।'[৭৯]

সমালোচক রামগতি ন্যায়রত্ন উল্লেখ করেছেন :

> 'মেঘনাদবধ মাইকেলসাগরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন। ইহাতে কবি-কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, সহৃদয়তা ও কল্পনাশক্তির এক শেষ প্রদর্শন করিয়াছেন।'[৮০]

এরপরে একে একে আসে 'ব্রজাঙ্গনা' এবং 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। 'ব্রজাঙ্গনা'য় তাঁর প্রকৃতিগত রোমান্টিক লিরিক্যাল মানসপ্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। এই কাব্যেই আঙ্গিক-সচেতন কবিকল্পনার হাতে আধুনিক লিরিক কবিতারও প্রথম জন্ম। এই কাব্যের বিষয় মূলত রাধার বিরহ। এর ভাষা সহজ এবং ছন্দ অনুপম। সমালোচক সুকুমার সেন চমৎকার বলেছিলেন :

> 'হৃদয়পাশে বন্দিনী হইয়া যে নারী অদৃষ্টের নির্যাতন সহিতেছে সেই নারীই মধুসূদনের কাব্য-নাটকের নায়িকা।...ইহার মধ্যে দুইটি নারী সবার উপরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে- ভাগ্যবঞ্চিতা সীতা, আর বল্লভবঞ্চিতা রাধা।...মধুসূদনের কল্পনাকে বার বার নাড়া দিয়াছে বিরহ-বিধুর রাধা-যমুনাতীরে ও কদম্বতলে। শুধু ব্রজাঙ্গনা কাব্যে নয়, অন্যত্রও কবির চিত্ত ব্রজবধূর বিরহছায়ামেদুর।'[৮১]

'বীরাঙ্গনা কাব্য' মধুসূদনের কবি-স্বভাবের পরিণত অভিব্যক্তি বললে ভুল হয় না। ইতালীয় কবি ওভিদের 'Heroides' কাব্যের আদর্শে এই কাব্য রচিত হয়। এটি পত্রকাব্য। বিভিন্ন পৌরাণিক নারীচরিত্রেরা এখানে তাঁদের প্রণয়ী বা পতির উদ্দেশে পত্র রচনা করেছেন। প্রতিটি পত্রেই স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবের বিকাশ লক্ষিত হয়েছে। পত্রগুলি কাল্পনিক হলেও স্বামী বা প্রেমিক কর্তৃক কোনো না কোনোভাবে প্রতারিত হওয়ার মত যে কাহিনি পত্রগুলিতে আছে তার মূলে মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনের ছায়াকে

অগ্রাহ্য করা চলে না। প্রথমা পত্নী রেবেকার প্রতি করা অন্যায় প্রবঞ্চনাই সম্ভবত তাঁকে আজীবন তাড়িত করেছে। এগুলি সেই বিবেক দংশনেরই ফল। তবে রেবেকার মতই এই কাব্যের নারীরাও দুর্বল নয়। বাহুবলে না হলেও মানসিক দৃঢ়তায়, প্রথা ভেঙে নিজের শর্তে বাঁচতে চাওয়ায় এবং প্রচলিত বিধানের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলায় এই কাব্যের প্রতিটি নারীচরিত্র বীরাঙ্গনা হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই।

সবশেষে আসে তাঁর রচিত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র প্রসঙ্গ। বাংলা ভাষায় এই প্রথম চতুর্দশপদী কবিতার জন্ম আগমন ঘটেছিল। এগুলি লেখা হয়েছিল ফ্রান্সে। সুকুমার সেনের কথায় :

> 'সেই সুদূর সাগর-পারের দেশে যখন ঘরছাড়া কবির চিত্তে "মন-কেমনের হাওয়ার পাকে অনেক স্মৃতি" ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল তখনই এই সনেটগুলির জন্ম (১৮৬৫)। দেশের আকাশ-বাতাস-গন্ধ-স্পর্শের জন্য ব্যাকুল মধুসূদনের মনোবেদনার রেশ চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে গুঞ্জরিত।'[৮২]

এই কবিতাগুলিতে কবির আত্মপ্রকাশের লক্ষণ সর্বাধিক। এগুলি যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ রচনা। কবির মর্ম-পীড়িত বেদনার উচ্ছ্বাস কবিতাগুলিতে প্রাণসঞ্চার করেছে। স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ট্রাজেডি এসব কবিতার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। সুকুমার সেন মধুসূদনের প্রতিভার উপমান হিসেবে উল্কার উল্লেখ করে বলেছেন :

> 'উল্কার জীবনে উদয়-অস্ত, তাহার দীপ্তিতে হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। অকস্মাতের এক সংঘাতে সে তীব্রতম রশ্মি লইয়া আবির্ভূত হইয়া অকস্মাতের অপর এক সংঘাতে নিঃশেষে বিলীন হইয়া যায়। যেটুকু সময় দৃষ্টিগোচরে থাকে তাহাতে তাহার প্রখর উজ্জ্বলতা নয়ন ধাঁধাইয়া দেয়, আমরা ভালো করিয়া ঠাহর করিতে পারি না। নির্বাপিত হইয়া গেলে তবেই তাহার পরিচয় ধরা পড়ে। মধুসূদনের প্রতিভা সেইরকমই ছিল।'[৮৩]

বঙ্গ কাব্য-সরস্বতীর ভাণ্ডারে বিবিধ রতন আহরণ করা এই কবির আবির্ভাব না ঘটলে বাংলা কাব্যে রেনেসাঁস থাকতো আকাশকুসুম হয়ে, তাতে সন্দেহ নেই।

এই সময় মূলত তিনটি ধারায় কবিতার চর্চা চলছিল। প্রথমত মধুসূদনের অনুসরণে মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য রচনা, ঈশ্বর গুপ্তের ধাঁচে কিছু ব্যঙ্গ কবিতা এবং নতুন রূপে উদ্ভাবিত গীতিকাব্যের চর্চা। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রমুখ। এই সময় শিক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবোধে দীপ্ত হয়ে উঠছিল ক্রমশ। ইংরেজি সাহিত্যে যে দেশপ্রেমের স্বাদ পাওয়া গিয়েছিল তা নতুন করে বিকশিত হচ্ছিল

টডের রাজস্থান-কেন্দ্রিক বীরগাথাগুলি সামনে আসায়। প্রথম পর্বে হিন্দুত্ব আর ভারতীয়ত্ব অভিন্নার্থক হিসেবে বিবেচিত হলেও ক্রমে ভারত-সুহৃদ হিসেবে শিক্ষিত বাঙালির কাছে গণ্য ইংরেজ শাসকদের অনাচারের চেহারাটিও ধরা পড়তে শুরু করেছিল। তখন সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে জাতীয়তাবোধের পোষকতা শুরু হয়েছিল প্রকাশ্যে। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ) সেই যুগের ফসল। উদীয়মান যুবক হিসেবে হেমচন্দ্র কুখ্যাত 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট' প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নাগরিক বাঙালি সমাজ সিপাহী বিদ্রোহকে প্রত্যাখ্যান করলেও ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের নীলবিদ্রোহ নাগরিক বাঙালির মনে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল এবং ইংরেজদের নিরন্তর পীড়ন বাঙালির রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের চেতনাকে উৎসুক করে তুলছিল। হেমচন্দ্রের কাব্যে কিছুটা হলেও তার ছায়াপাত লক্ষিত হয়। সমালোচক তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন :

> 'What Tennyson felt for England, Burns for Scotland, Dante for Florence, the German Romanticists after Jena (1806) for Germany, Hemchandra felt for India.'[৮৪]

তাঁর 'ভারত বিলাপ' কবিতার জন্যে রাজরোষেও পড়তে হয়েছিল তাঁকে। তাই পরে প্রিন্স অফ ওয়েলসের (পরবর্তী ৭ম এডওয়ার্ডের) আগমন উপলক্ষে তাঁকে 'ভারতভিক্ষা' লিখতে হয়েছিল। তাঁর প্রথম কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিণী' (১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ) বাল্যবন্ধুর অকালমৃত্যুতে শোকাহত হয়ে রচিত। দ্বিতীয় কাব্য 'বীরবাহু কাব্য' (১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ) তে সক্রিয় দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এরপর রচিত হয়েছিল 'ছায়াময়ী কাব্য' (১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ), 'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ), 'চিত্তবিলাস' (১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি। কিন্তু যে কাব্যের জন্য হেমচন্দ্র অমর হয়ে আছেন তার নাম 'বৃত্রসংহার'। মহাকাব্য সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা থেকেই এর জন্ম। মোট ২৪ সর্গে দুটি খণ্ডে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ ও ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ এটি প্রকাশিত হয়েছিল। এখানেও জাতিবৈর এর নিন্দা এবং পরাধীনতার যন্ত্রণার ছবি স্পষ্ট। পর-পদানত স্বদেশভূমি প্রসঙ্গে সেখানে চমৎকার ব্যক্ত হয়েছে :

'কে আছে ত্রিলোকমাঝে প্রাণী হেন জন,
সুদূর প্রবাস ছাড়ি স্বদেশে ফিরিয়া...
নাহি ভাসে উল্লাসে, না বলে মত্ত হয়ে
"এই জন্মভূমি মম!" কে আছে রে, হায়,
ফিরিয়া স্বদেশে পুনঃ না কাঁদে পরাণে
হেরে শত্রু-পদাঘাতে পীড়িত সে দেশ!'[৮৫]

এ কাব্যে শিথিলতা এবং দুর্বলতা থাকলেও তাঁর এই রচনা ইতিহাসের দিক থেকে অবশ্যই স্মরণীয়। সমালোচক হরেন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত হেমচন্দ্রের জাতীয়তার ধারণা সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন :

> 'Hemchandra's nationalism had, of course, a sort of Tennysonian conservatism about it, not because it was as much insular in its outlook, but because it arose out of a fervent desire to see his poor countryrestored to her former greatness; and what, therefore, had the ultimate effect of affecting adversely the vital interests of India, socially or spiritually, came in for his gentle satire, if not severe denunciation.'[৮৬]

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে সজনীকান্ত দাসের মূল্যায়ন নিম্নরূপ :

> 'হেমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে ও বাঙ্গালীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন; কারণ তিনি আমাদের স্বাজাত্য-বোধ ও স্বদেশপ্রেম যে পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন এমন আর সে যুগে কোন কবি করেন নাই।'[৮৭]

একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

সাহিত্যক্ষেত্রে হেমচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর কবি-চেতনার ভাবব্যাকুলতা অনেকক্ষেত্রেই আতিশয্যের সীমা অতিক্রম করে যেত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অবকাশরঞ্জিনী' দু-খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি খণ্ড কবিতার সংকলন। এর মধ্যে সংকলিত 'ভারত-উচ্ছ্বাস' কবিতাটি যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে রচিত। এর জন্য কবি পঞ্চাশ গিনি পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশের পর তাঁর কবিখ্যাতি যথেষ্ট ছড়িয়ে পড়েছিল। এই কাব্যে বায়রনের প্রভাব আছে। সুকুমার সেন বলেছেন :

> 'পলাশির মাঠে ইংরেজের কাছে বাঙ্গালীর স্বাধীনতার বিনাশ তখনকার শিক্ষিত যুবকদের মনে যে লজ্জা জাগাইতে শুরু করিয়াছিল বাঙ্গালা কাব্যে তাহার স্পষ্ট প্রকাশ হইল নবীনচন্দ্রের পলাশির যুদ্ধে। অবশ্য নবীনচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে সিরাজদ্দৌলার সমর্থন করেন নাই। কেননা তখনও সিরাজের ইতিহাস একতরফাই জানা ছিল-ইংরেজ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে।...অগত্যা মোহনলালকে কাব্যের নায়ক করিয়া নবীনচন্দ্রকে রফা করিতে

> হইয়াছিল। রাজপুত-ইতিবৃত্তের বকলম এড়াইয়া নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যে দেশের পরাধীনতার যে মর্মবেদনা ধ্বনিত করিলেন তাহা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার বিশিষ্টতার পরিচায়ক।'[৮৮]

এরপর বলতে হয় নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী কাব্য 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' (১৮৮৬, ১৮৯৩, ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ) এর কথা। মহাভারতের অন্যতম মহামহিম বৈপ্লবিক চরিত্র শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে তিনি এই কাব্যের পরিকল্পনা করেছিলেন। মর্মকথা হল নিষ্কাম প্রেমের ডোরে আর্য ও অনার্যের বন্ধন এবং অখণ্ড হিন্দু-সংস্কৃতির পত্তন। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মত প্রাজ্ঞ সমালোচকও কাব্যটির সমালোচনায় এই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন :

> 'রৈবতকের এই সো হহং সর্গ, গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের অনুকরণে লিখিত। জগতের কাব্যে অতুল্য, সেই মহাকাব্যের মত, এই মহান উচ্চ, অপার্থিব সর্গের সমালোচনা অসম্ভব। তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে বাঙ্গালাকাব্যে এমন আর কিছু পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আর বিশ্বপদ্মে বিশ্বনাথের অধিষ্ঠান বর্ণনায়, কবি যে, কত চিন্তাশক্তি, কত দার্শনিকতা, কত কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কথায় বুঝান যায় না।'[৮৯]

এরপর উল্লেখ করতে হয় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ)-র নাম। তাঁর গাথাকাব্য-কল্পনা একদা কিশোর রবীন্দ্রনাথের ভাব-ধর্মের পথপ্রদর্শক হয়েছিল। 'জীবনস্মৃতি' তার সাক্ষ্য বহন করছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন :

> 'অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন।...গান এবং খণ্ডকাব্য লিখিতেও ইঁহার ক্ষিপ্রতা অসাধারণ ছিল। অথচ নিজের এই সকল রচনা সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র মমত্ব ছিল না। কত ছিন্ন পত্রে তাঁহার কত পেন্সিলের লেখা ছড়াছড়ি যাইত সেদিকে খেয়ালও করিতেন না। রচনা সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতার যেমন প্রাচুর্য তেমনি ঔদাসীন্য ছিল। 'উদাসিনী' নামে ইঁহার একখানি কাব্য তখনকার বঙ্গদর্শনে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।'[৯০]

সমালোচক ভূদেব চৌধুরী উল্লেখ করেছেন :

> 'মধুসূদন-ভগীরথের প্রবাহিত মর্ত্যগঙ্গায় প্রেমঘন গার্হস্থ্য জীবন-চিন্তার প্রথম মঙ্গল-কলসটি যিনি ভরে নিয়েছিলেন, তিনি

অক্ষয়চন্দ্র; আর সে কাব্য-কলসীর নাম 'উদাসিনী' (১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ)।'[৯১]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও উচ্চদরের কাব্য রচয়িতা ছিলেন। কল্পনার পাখা বিস্তারে ও রচনার স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁর কাব্য অনন্য হয়ে উঠত। তার সার্থক দৃষ্টান্ত 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ)। সমকালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছিলেন :

> 'কেহ যদি বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে শেলীর আস্বাদ পাইতে চায় তাহা হইলে এই গ্রন্থখানি হইতে পাইবে।'[৯২]

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের অন্তঃসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন :

> 'স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ...ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে।'[৯৩]

এছাড়াও সে সময়ে বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছিল শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭-১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ) 'নির্বাসিতের বিলাপ', 'পুষ্পমালা', 'হিমাদ্রি-কুসুম', 'পুষ্পাঞ্জলি', ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৫৬-১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ) 'চিত্ত-মুকুর', 'বাসন্তী', 'যোগেশকাব্য', 'চিন্তা', রাজকৃষ্ণ রায়ের (সম্ভবত ১৮৪৯-১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ) 'বঙ্গভূষণ', 'নিভৃতনিবাস', 'অবসর-সরোজিনী' ইত্যাদি।

এরপর আলাদা করে বলতেই হবে বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ)-র কথা। তাঁকে দিয়েই সার্থক বাংলা গীতিকবিতার সূচনা। তিনি গীতিকবিতার ধারায় 'ভোরের পাখি'। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে মহাকাব্যিক কাব্য-ভাবনা যুগের লক্ষণ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল বিহারীলাল সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দেননি। তিনি নিজস্ব পন্থায় কাব্য-সরস্বতীর সাধনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

> 'বিহারীলাল তখনকার ইংরেজি ভাষার নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধ-বর্ণনা-সংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না,---তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন।'[৯৪]

তাঁর কাব্যে বিশ্ব বা দেশহিতের কথা ছিল না, ছিল অন্তরঙ্গ আত্মমগ্ন স্বগত-ভাষণ। বিশুদ্ধ মন্ময়তা ছিল তাঁর কাব্যের সম্পদ। 'সংগীতশতক', 'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গসন্দর্শন', 'বন্ধুবিয়োগ', 'প্রেমপ্রবাহিণী', 'সারদামঙ্গল' তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। সমালোচক রামগতি ন্যায়রত্ন বলেছেন :

> 'ইংরাজ কবি Blake যেমন ইংলন্ডে একটা নূতন সুরে নূতন ঝঙ্কারে তাঁহার বীণা বাজাইয়াছিলেন, আমাদের মধ্যে বিহারীলালও তদ্রূপ একটা অপরিচিত-পূর্ব্ব মনোমোহন-নবীনতায় তাঁহার সমসাময়িক কাব্যসাহিত্য অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।'[৯৫]

পরে এই ধারাতেই অবগাহন করেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ), দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০ খ্রিস্টাব্দ), অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬১-১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রমুখ কবি। তাঁদের রচিত কাব্যের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের 'ফুলবালা', 'অশোকগুচ্ছ', 'শেফালিগুচ্ছ', 'পারিজাতগুচ্ছ', 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা' এবং অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা' উল্লেখযোগ্য।

নাটক

এরপর আসি নাটকের কথায়। সাধারণভাবে শিল্প-সাহিত্য মাত্রেই জীবন-সম্ভব। কিন্তু দেশ কালের ভেদে এবং জীবনবোধের পার্থক্য অনুসারে সাহিত্যের ভাব-ধর্মের যেমন রূপান্তর ঘটে তেমনই সেই অনুযায়ী নানাবিধ প্রকরণও বিকশিত হয়ে ওঠে। নাটক তেমনই এক শিল্প প্রকরণ। নাটক বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সুকুমার সেন বলছেন :

> 'নাটক বলিতে এখন যাহা বুঝি তাহা আমাদের দেশে ইংরেজ আমলের আগে ছিল না। তখন ছিল যাত্রা। তাহার সহিত নাটকের খানিকটা মিল আছে নিশ্চয়ই, অমিলও আছে অনেকটা। বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি যাত্রা হইতে হয় নাই, তবে যাত্রার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।'[৯৬]

আদিকাল থেকে বাঙালির নিজস্ব নাট্যস্বভাবের সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র নাট্যসাহিত্যের ধারা গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। রুচি, প্রয়োজন, ঐতিহ্যের সঙ্গে তার একটা গূঢ় সংযোগও ছিল। মূলত যাত্রাকে আশ্রয় করে বাংলার নিজস্ব নাট্যরীতি নানা ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। কৃষ্ণকথাকে আশ্রয় করে যাত্রার প্রসার ঘটেছিল কৃষ্ণযাত্রা রূপে। তারপর নতুন যুগের অভ্যুদয়ের সন্ধিলগ্নে নবজাগরণশীল, উদীয়মান নাগরিক সমাজের চিত্ত-বিনোদনের তাগিদে যাত্রার পুনরভ্যুত্থানের প্রয়োজন হয়েছিল। ধনী-গৃহে 'বিদ্যাসুন্দর', 'কলিরাজার যাত্রা', 'নল দময়ন্তীর যাত্রা' ইত্যাদি অভিনীত হত তার প্রমাণ আছে 'সমাচার দর্পণ' সহ নানা পত্রিকার পাতায়। আগেই দেখা গেছে নতুন ধনতান্ত্রিকতার হাত ধরে অষ্টাদশের শেষ পর্ব থেকেই নতুন নাগরিক সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছিল আর উনিশ শতকে তাতে যোগ হয়েছিল নতুন মাত্রা। প্রতীচ্যের শিক্ষা, সভ্যতা

আর সংস্কৃতি আস্তে আস্তে শিকড় ছড়াতে শুরু করেছিল এদেশের শিক্ষিত শিষ্ট নাগরিক মানুষের মনের মাটিতে। ইংরেজদের আমোদের জন্য নাট্যশালার পত্তন কলকাতায় পলাশি-পর্বের আগেই সূচিত হয়েছিল। উনিশ শতকে তার প্রসার ঘটে আরও বেশি করে। তাদের নাট্যাভিনয় বিষয়টা এদেশের মানুষকে কৌতূহলী করেছিল সন্দেহ নেই। তবে প্রথমদিকে ইংরেজদের প্লে হাউস গুলিতে দেশীয়দের প্রবেশাধিকার ছিল না। ইতিমধ্যে গেরাসিম লেবেডেফ (১৭৪৯-১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ) নামে একজন রুশ ব্যক্তি ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে বিলিতি ধরনের রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের অভিনয় মঞ্চস্থ করেন। 'The Disguise' নামক ইংরেজি নাটক বাংলায় অনুবাদ করে এই নাটক করা হয়েছিল। বাক্যরীতি আড়ষ্ট এবং কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ হলেও তা আশাতীত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। যদিও তার সঙ্গে বাংলা নাটকের ধারাবাহিক ইতিহাসের যোগ সামান্যই। এই অভিনয় বাঙালির চিত্ত বিনোদনে সফল হলেও তার চিত্ত উদ্বোধনের জন্য ইংরেজি শিক্ষার সঞ্জীবনীর প্রয়োজন ছিল। অধ্যাপক পুলিন দাস জানিয়েছেন :

> '১৮০৫ খ্রিঃ কলকাতায় যেসব বিলেতি বইপত্র আসে তার মধ্যে বাইবেলের সংখ্যার পরেই ছিল শেক্সপিয়রের গ্রন্থাবলি-মোট ৬০ খানা।'[৯৭]

অধ্যাপক পবিত্র সরকার (১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ) জানাচ্ছেন :

> '১৮১৭-তে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অন্তর্গত বিষয় হিসেবে নাটকপাঠ ও ক্লাসঘরেই অভিনয়ানুকরণ অধ্যাপনা-অধ্যয়নের এক স্বাভাবিক অঙ্গ হয়ে ওঠে এবং ডিরোজিও ও অধ্যক্ষ রিচার্ডসন দুজনেই এই শিক্ষালয়ের নাট্যকর্মে ছাত্রদের যথেষ্ট উৎসাহ ও নেতৃত্ব দিতেন, নিজেরাও অভিনয় করতেন।'[৯৮]

বিশেষ করে হিন্দু কলেজে ডি এল রিচার্ডসনের (১৮০১-১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ) হাত ধরে শেক্সপিয়রের নাটকপাঠ নবীন ছাত্রদের অন্তরে অদ্ভুত আলোড়ন তুলেছিল। ইংরেজি আঙ্গিকের নাট্যকলার প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়তে শুরু করেছিল। ইংরেজদের মত নাট্যমঞ্চ গঠনের প্রস্তাবও ভেসে বেড়াচ্ছিল বাতাসে। তারপর ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের (১৮০১-১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ) উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল 'হিন্দু থিয়েটার'। এটিই বাঙালি প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। এরপর ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে মঞ্চ তৈরি করে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় হয়েছিল। এরপর আস্তে আস্তে এই অভিনয়ের চল বাড়তে থাকে। আর নতুন নতুন নাটকও লেখা হতে থাকে। কিন্তু সার্থক পথটি তখনও পুরোপুরি খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। একদিকে

ইংরেজি নাটক, অন্যদিকে সংস্কৃত নাট্যকলার অনুবাদের হাতছানি, এরমধ্যেই বাংলা নাটক তার পথ সন্ধান করে ফিরছিল। পণ্ডিত সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন :

> 'ঠিক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে লেখা না হইলেও সংস্কৃত নাটকের নাট্যানুবাদ লইয়াই ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝের দিকে বাঙ্গালায় নাটক-ছাঁদের রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন অনূদিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকই এই ধরনের প্রথম লেখা (রচনাকাল ১২৪৬)।'[৯৯]

এরপর বাংলায় মৌলিক নাটক রচনার সূত্রপাত হয়। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় জি সি গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' এবং তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'। 'কীর্তিবিলাস' বাংলা ভাষায় প্রথম বিষাদান্ত নাটক। অন্যদিকে 'ভদ্রার্জুন' প্রথম মধুরান্তিক বাংলা নাটক। এরপর হরচন্দ্র ঘোষ শেক্সপিয়রের 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' অবলম্বনে লিখেছিলেন 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ) এবং 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' অবলম্বনে 'চারুমুখ চিত্তহরা' (১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ)। এই পর্বে শেক্সপিয়রের আরও কিছু নাটকের অনুবাদ হয়েছিল, যেমন শেক্সপিয়রের সিম্বেলিন অবলম্বনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুশীলা-বীরসিংহ', চন্দ্রকালী ঘোষের 'কুসুমকুমারী নাটক', ওথেলো অবলম্বনে তারিনীচরণ পালের 'ভীমসিংহ', 'টেমপেস্ট' অবলম্বনে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নলিনীবসন্ত' ইত্যাদি অনেক নাটকেরই নাম করা যেতে পারে। এরপর নাটকের আসরে আবির্ভূত হন রামনারায়ণ তর্করত্ন ওরফে নাটুকে রামনারায়ণ (১৮২২-১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর প্রথম নাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব নাটক' (১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ) যদিও তাঁর মৌলিক চিন্তার ফসল ছিল না। রংপুর কুণ্ডী পরগনার জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রদত্ত বিজ্ঞাপন অনুসারে রামনারায়ণ নাটকটি রচনা করেন এবং পুরস্কার লাভ করেন। কৌলীন্যপ্রথার বর্বরতার মূলে কুঠারাঘাত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এই 'সামাজিক সমকালীনতার চাপই আসলে যথার্থ বাংলা নাটকের ধারাবাহিক ইতিহাসের জন্মদাতা'[১০০] বলে পবিত্র সরকার দাবি করেছেন। তাঁর মতে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সমাজ-সংঘট্টের এই প্রবলতা না থাকলে মৌলিক বাংলা নাটকের উদ্ভব আরও পিছিয়ে যেত সন্দেহ নেই। এরপর ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার', শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী', কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তল', ভবভূতির 'মালতীমাধব' ইত্যাদি নাটকের অনুবাদ করেছিলেন তিনি। এর মধ্যে রত্নাবলী পাইকপাড়ার রাজাদের আনুকূল্যে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়েছিল। পরে তিনি 'রুক্মিণীহরণ', 'কংসবধ', 'ধর্মবিজয়', 'স্বপ্নধন' ইত্যাদি মৌলিক নাটক রচনা করেন। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয় তাঁর 'নবনাটক' (১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ) নামক সামাজিক নাটক। এটি জোড়াসাঁকো নাট্যশালার প্রধান কর্মকর্তা গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘোষিত পুরস্কারপ্রাপ্ত। এছাড়া তাঁর রচিত কিছু

প্রহসন হল 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', 'উভয়সঙ্কট', 'চক্ষুদান' ইত্যাদি। উনিশ শতকের নানাবিধ সমাজ বিপ্লব নাটকে উঠে আসছিল ক্রমশ। তারই ফল উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক' (১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ)। এই সময়েই বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের উদ্যমকে সমর্থন করে এই নাটকটির জন্ম হয়েছিল।

ইতিমধ্যে ইংরেজি আঙ্গিকে বাংলা নাটক রচনার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সেকালের নাটকের আঙ্গিক ও অন্তর্বস্তুতে সেকালের দ্বিধার ছাপটি স্পষ্ট। ভাবে এবং রূপে সেকালের নব জীবনের আর্তিকে পূর্ণ রূপায়িত করার মত মহান নাট্য-প্রতিভা তখনও বাংলার নাট্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়নি। এই সময় বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধির সময়কাল। উত্তীর্ণ কৈশোর এবং অনাগত যৌবনের অভূতপূর্ব মেলবন্ধন নাটকের ইতিহাসে ঘটালেন যিনি, তিনি মধুসূদন দত্ত। বাংলা নাট্য-ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব কিছুটা আকস্মিক। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়ে বাংলা নাটকের দীনতা তাঁকে পীড়িত করে এবং তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাংলা নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ)-র প্রথম সংস্করণে প্রস্তাবনা অংশে তিনি লিখেছিলেন :

'অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে বিষবারি পান করে
তাহে হয় তনু মনঃ ক্ষয়।'[১০১]

মহাভারতের আদিপর্বের কাহিনি অবলম্বনে তিনি এই নাটক রচনা করেন। এই নাটকে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব লক্ষিত হয়। এরপর গ্রিক পুরাণের একটি আখ্যায়িকা অবলম্বনে মধুসূদন 'পদ্মাবতী' (১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ) নাটকের পরিকল্পনা করেন। এতেও সংস্কৃত নাটকের আদর্শ ছায়াপাত করেছে। 'পদ্মাবতী'র পর রচিত হয় 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ)। এতেই নাট্যকার সচেতন ভাবে পাশ্চাত্য কলাঙ্গিকের প্রয়োগ করেন। নাটকের কাহিনি সংগৃহীত হয়েছিল টডের রাজস্থান গ্রন্থ থেকে, অর্থাৎ এর বিষয়বস্তু ইতিহাস-ভিত্তিক। এটি বাংলা নাটকের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি। এছাড়া তিনি দুটি উৎকৃষ্ট প্রহসন রচনা করেছিলেন। একটি হল 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ), অন্যটি 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ)। প্রথমটির বিষয় নব্যশিক্ষিত যুবকদের অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা আর দ্বিতীয়টি কপট ধর্মাচারী নারীলোভী বৃদ্ধদের গোপন লাম্পট্য নিয়ে রচিত। উভয়ের নৈতিক অনাচারকেই মধুসূদন এখানে যথেচ্ছ ব্যঙ্গের চাবুক মেরেছেন।

এর ঠিক পরেই উল্লেখ করা যায় দীনবন্ধু মিত্রের নাম (১৮২৯-৭৪ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ) নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে

রচিত। এটি তিনি স্বনামে প্রকাশ করতে পারেন নি। তবে এর ফলে দেশে যেমন সাড়া পড়ে গিয়েছিল তা আগে ঘটেনি। এর ইংরেজি অনুবাদ হলে বিলেতেও এই আগ্নেয় পরিস্থিতির ধাক্কা পৌঁছেছিল। অনুমিত হয় মধুসূদন দত্ত এর ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। এটি দেশব্যাপী আন্দোলনে ঘৃতাহুতির কাজ করেছিল। ইংরেজি অনুবাদের প্রকাশক হিসেবে নাম প্রকাশ করে রেভারেন্ড লঙ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। এরপর একে একে লেখা হয়েছিল 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ), 'লীলাবতী' (১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ), 'জামাই বারিক' (১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ), 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি। 'নীলদর্পণ' আর 'কমলে কামিনী' বাদ দিলে বাকি সবই প্রহসন-ধর্মী রচনা। সমাজের নানা ব্যভিচার তাঁর এসব রচনায় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ করতেন। কিন্তু যেখানে অভিজ্ঞতার অভাব ঘটত সেখানে তাঁর সৃষ্টি কিছুটা হলেও গতানুগতিকতার দ্বারা গ্রস্ত হয়ে পড়ত। তবে তাঁর নাটকের জনপ্রিয়তা ছিল প্রভূত। পেশাদারি রঙ্গমঞ্চেও এগুলি নিয়মিত অভিনয় হত। দীনবন্ধু আসলে সমকালকে উপেক্ষা করেন নি। তাই সেকাল জীবন্ত হয়ে আছে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে।

দীনবন্ধুর পর বাংলা নাটককে খানিকটা নতুন পথের দিশা দেখিয়েছিলেন মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি সেকালের জাতীয় চেতনা সৃষ্টির প্রাণ-কেন্দ্র 'হিন্দুমেলা'র একজন অন্যতম সক্রিয় সদস্য ছিলেন। স্বদেশপ্রীতি ও অতীতের ঐতিহ্যের জাগরণ এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচীন ঐতিহ্য বিষয়ে তিনি ছিলেন উৎসাহী। তাছাড়া তিনি ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের অনুগামী। বাঙালির আবেগ আর গীতিপ্রাণতার বিষয়ে ছিলেন ওয়াকিবহাল। তাই মঞ্চাশ্রয়ী নাট্যকলার কাঠামোর ওপর যাত্রা আর পাঁচালীর রীতি আরোপ করে, আবেগ আর সঙ্গীতের মিশ্রণে নতুন নাট্যসম্ভাবনার পথ খুলে দিলেন। সমালোচক সুকুমার সেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

> 'মনোমোহনের পৌরাণিক নাটকের মধ্য দিয়া নাটকে পুরাতন যাত্রা-পাঁচালীর কারুণ্য ও ভক্তিভাব এবং কথকতার বাক্যবয়ন দেখা দিল নূতন সংস্থায় নূতনতর ভঙ্গিতে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে এবং ব্রজমোহন রায়, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, মতিলাল রায় প্রভৃতির 'গীতাভিনয়' বা যাত্রা-পালায় মনোমোহনের আদর্শেরই অনুসরণ। মনোমোহনের গানের সুরও প্রধানভাবে দেশি। এইভাবে মনোমোহনের নাট্যরচনা পুরাতন-নূতনের সন্ধিবন্ধন করিয়াছে।'[১০২]

তাঁর প্রথম রচনা 'রামাভিষেক নাটক অথবা রামের অধিবাস ও বনবাস' (১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ) করুণ রসাশ্রিত পৌরাণিক নাটক। এছাড়া উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে 'সতী নাটক' (১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ), 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' (১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ), 'পার্থপরাজয় নাটক' (১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ), 'রাসলীলা নাটক' (১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে।

আমাদের মনে রাখতে হবে সংস্কৃত আর ইংরেজি নাটকের অনুসরণে বাংলা নাটকের অভিনয় মূলত ব্যক্তিগত উদ্যোগেই শুরু হয়েছে এবং সেকালে দীর্ঘদিন পারিবারিক রঙ্গমঞ্চেরই যুগ চলেছে। নাটক মঞ্চস্থ করার বিষয়টি ব্যয়বহুল হওয়ায় সীমিত ধনী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা নিয়েই তাকে অগ্রসর হতে হয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে অভিজাত পরিবারে অভিনয় হওয়ায় আমন্ত্রিত অতিথি ছাড়া জনসাধারণ প্রবেশাধিকারও পায়নি। নাট্যাভিনয় উপভোগের জন্য সাধারণ মানুষকে অপেক্ষা করতে হয়েছে উনিশ শতকের অন্ত্য-মধ্য পর্ব পর্যন্ত। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ন্যাশনাল থিয়েটার। এর ফলে বাংলা নাট্য জগতে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটেছে। সাধারণ মানুষের সামনে খুলে গেছে মঞ্চের আশ্চর্য জগৎ। নাটকের এই বন্ধন-মুক্তি পর্বের ইতিহাসে হিন্দুমেলার একটা অবদান ছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। হিন্দুমেলার অন্যতম উদ্যোক্তা মনোমোহন বসু ন্যাশনাল থিয়েটারেরও অন্যতম সক্রিয় উদ্যোক্তা ছিলেন। সমালোচক ভূদেব চৌধুরী বলেছেন :

> 'হিন্দুমেলা, এবং সেই সঙ্গে কেশবচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্মান্দোলনের প্রভাবে বাংলার নাগরিক 'হিন্দু' সমাজে জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় ও শ্রেণিবুদ্ধিমুক্ত যৌথ জীবন-প্রেরণা তখন এককেন্দ্রিক হয়েছে। সেই সর্বজনীন চেতনাকে যুগোচিত সামগ্রিক শিল্পরূপ দিয়েছে সেদিনকার নাট্যকার, রঙ্গমঞ্চ ও দর্শকজনের সমবেত সম্মিলিত ভাবসাযুজ্য।'[১০৩]

সাধারণ রঙ্গালয়গুলিকে সচল রাখার জন্য প্রয়োজন হয়েছে নতুন নতুন নাটকের। রাজকৃষ্ণ রায়, হরলাল রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রনাথ দাস, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখের কলমের সহায়তায় বাংলা নাট্যজগৎ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে ক্রমশ। রাজকৃষ্ণ রায়ের (১৮৪৯-৯৪ খ্রিস্টাব্দ) রচিত নাটকের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল 'প্রহ্লাদ চরিত্র'। এছাড়া 'অনলে বিজলী', 'হরধনুর্ভঙ্গ', 'নরমেধ যজ্ঞ', 'বামনভিক্ষা', 'যদুবংশধ্বংস', 'চন্দ্রহাস' ইত্যাদি তিনি রচনা করেন। এর মধ্যে 'হরধনুর্ভঙ্গ' লেখা হয়েছিল ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে। 'জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব সমসাময়িক নাট্যরচনার মধ্যে সর্বপ্রথম দেখা গিয়েছিল হরলাল রায়ের 'হেমলতা' নাটকে বলে সুকুমার সেন দাবি করেছেন।'[১০৪] অন্যদিকে

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের (১৮৪৮-১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ) 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', 'অলীকবাবু', 'হঠাৎ নবাব', 'হিতে বিপরীত' ইত্যাদি প্রহসন দর্শকের মনোরঞ্জনে সক্ষম হয়েছিল। অন্যদিকে হিন্দুমেলার মধ্যে দিয়ে যে দেশানুরাগের অঙ্কুর বিকশিত হচ্ছিল তার অভিব্যক্তি পাওয়া গেল তাঁর রচিত 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী'র মত নাটকে। আবার হিন্দুমেলার আদর্শে উদ্বুদ্ধ নাট্যকারদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ দাসের (১৮৪৮-১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত 'সুরেন্দ্র–বিনোদিনী'র অভিনয় একসময়ে সরকারি নির্দেশে বন্ধ রাখতে হয়েছিল রাজদ্রোহের বীজ থাকায়। তবে উনিশের দ্বিতীয় পর্বে দুটি বড় ঘটনা :

> 'বাংলা নাটকের এবং নাট্য-প্রশাসনের ইতিহাসকে স্থায়ীভাবে প্রভাবিত করে এবং তাদের চরিত্র আমূল বদলে সেয়। একটি হল ১৮৭৬ সালে আরোপিত নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন, অন্যটি নাট্যকর্মে সমবায় ভিত্তি ভেঙে ব্যক্তি-মালিকানার অনুপ্রবেশ।'[১০৫]

নাট্য-নিয়ন্ত্রণের ইতিহাস এখানে বিস্তৃতভাবে বলার প্রয়োজন নেই, শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে 'নীলদর্পণ', 'চা-কর দর্পণ', 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' ইত্যাদি নাটক কমবেশি শাসকের অস্বস্তির কারণ হলেও কলকাতায় প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমন এবং জগদানন্দের অন্তঃপুর ভ্রমণে যে নিন্দাবাদের ঢেউ উঠেছিল এবং 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' জাতীয় প্রহসনের জন্ম দিয়েছিল, তারই প্রত্যক্ষ পরিণাম এই আইনের বলবৎ হওয়া। এর ফলে জাতীয় চেতনার বিকাশের ইতিহাসে বাংলা রঙ্গমঞ্চ একটি সম্মানজনক আসন লাভ করেছিল, কিন্তু কলকাতার উজ্জীবিত নাট্যকর্মে এক বিপর্যয়ও ঘনিয়ে এসেছিল এর ফলে। বহু নাটক নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে মঞ্চাভিনয়ের উপযোগী নাটকের সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। এই পটভূমিতেই নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১১ খ্রিস্টাব্দ) আবির্ভাব। মঞ্চের অভিনয়-ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই তাঁকে নাটক রচনায় মনোনিবেশ করতে হয়েছিল। প্রথম পর্বে কিছু গীতিনাট্য রচনা করলেও তারপর তিনি মৌলিক নাট্যরচনায় মনোনিবেশ করেন। সারাজীবন পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক অজস্র নাটক ও প্রহসন তিনি রচনা করেছিলেন। প্রায় প্রতিটি নাটকই মঞ্চে সাফল্য লাভ করেছিল। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'রাবণবধ', 'সীতার বনবাস', 'অভিমন্যুবধ', 'সীতাহরণ', 'দক্ষযজ্ঞ', 'জনা'র কথা বলা যেতে পারে। সামাজিক-পারিবারিক নাটকের মধ্যে 'প্রফুল্ল', 'হারানিধি', 'বলিদান' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসিম', 'ছত্রপতি'র নামোল্লেখ করা চলে। তিনি মূলত মঞ্চের জন্য নাটক রচনা করেছেন, তাঁর নাটকে মেলোড্রামার প্রাবল্য লক্ষিত হয়, অভিনয়-সাফল্যের দিকে তাকিয়ে থাকায় অনেক

সময়েই সার্থক নাট্যরস সৃজনে কিছুটা বিঘ্ন ঘটেছে, তবু তাঁর কাছে অনুবর্তীদের ঋণ কম নয়।

অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) আবার সিদ্ধহস্ত ছিলেন প্রহসন রচনায়। বাংলাদেশে তিনি পরিচিত ছিলেন 'রসরাজ' হিসেবে। যদিও নানা বিষয় নিয়েই তিনি নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর নাটকের মধ্যে 'হীরকচূর্ণ', 'তরুবালা', 'হরিশচন্দ্র', 'যাজ্ঞসেনী' ইত্যাদির কথা বলা চলে, আর প্রহসনগুলির মধ্যে 'তিলতর্পণ', 'চোরের উপর বাটপাড়ি', 'বিবাহ বিভ্রাট', 'তাজ্জব ব্যাপার', 'রাজাবাহাদুর', 'কালাপানি' বা হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রা', 'বাবু', 'বৌমা', 'অবতার', 'ব্যাপিকা বিদায়', 'দ্বন্দ্বেমাতনম্' উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র–অমৃতলালের পরে উনিশ শতকের নবজাগরণিক নাট্য সাহিত্যের বিস্তৃতি ঘটেছিল ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মাধ্যমে। বলা যেতে পারে শতাব্দীর শেষ দশকে এই দুজন নাট্যকার নাট্যজগতকে সমৃদ্ধ করেন। উনিশ থেকেই বাংলা নাটকের যৌবন বিকশিত হয়ে উঠছিল ক্রমশ। এরপর বিশ শতকে তা পূর্ণ-সিদ্ধি লাভ করে। উনিশ শতকের শিষ্ট নাগরিক সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারায় নাটক একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। আবেগ-উচ্ছ্বসিত বাঙালির নাট্য-স্বভাব শেক্সপিয়রীয় নাট্যাঙ্গিকের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে প্রতীচ্যাভিমুখী হয়ে উঠেছিল। তারপর উপযুক্ত প্রতিভার স্পর্শে প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের নানা নাট্যলক্ষণের মেলবন্ধনে বাংলা নাটকের ক্ষেত্র প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হয়ে ওঠে। সেখান থেকেই আধুনিক নাট্য-সাহিত্যের সার্থক অগ্রগতির সূচনা হয়। আলোচ্য যুগের নাটকে তারই প্রতিফলন মিলেছে।

উপন্যাস

এবার উনিশ শতকের শিষ্ট নাগরিক সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সংরূপটির কথায় আসা যাক। তার নাম উপন্যাস। উপন্যাস একটা নতুন সময়ের জীবন-ভাষ্য। বিগত ও অনাগত সময়ের সন্ধিলগ্নে মননশীল মানুষের জীবনজিজ্ঞাসার প্রতিফলন হল উপন্যাস। সে নবজাগরণের মানসসন্তান। নবজাগরণের যা মূলমন্ত্র অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্বোধন তাই উপন্যাসের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে অনেকখানি প্রেরণা যুগিয়েছে। আধুনিক যুগেই উপন্যাসের উদ্ভব। মধ্যযুগের লক্ষণ যদি হয় পরলোকমুখিতা তাহলে আধুনিক যুগ ইহলোকমুখিতার দিশারী। এই ইহলোকমুখিতায় প্রথম শক্তি সঞ্চার করেছিল নবজাগরণ। মানুষের চিত্তবিকাশ ও আত্মস্বাতন্ত্র্যের বীজ বুনেছিল সে, মানবস্বীকৃতি যার প্রধানতম লক্ষণ হয়ে দাঁড়াল। তারই নির্দেশিকা নিয়ে উপন্যাসের আগমন। সাহিত্যের অঙ্গনে সে নবীন অতিথি। গণতান্ত্রিক চেতনার উদ্ভব, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক শ্রেণির আবির্ভাব, মুদ্রণযন্ত্রের ক্রমবিকাশ ও প্রসার, পাঠক সমাজের বহুল বিস্তৃতি ইত্যাদি নানা

সমীকরণের পথ বেয়ে তার আত্মপ্রকাশ। সহজে বললে উপন্যাস হল গদ্যে রচিত কাল্পনিক বর্ণনামূলক আখ্যানের সাহায্যে মানবজীবনের ব্যাখ্যান। এক তীব্র জীবনমুখিতা ও বাস্তব-ঘনিষ্ঠতাই তার অন্যতম শর্ত। উপন্যাসের বিশিষ্ট জীবনদর্শন বলতে আমরা বুঝি জীবনকে দেখবার এক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি, ইংরেজিতে যাকে বলা যেতে পারে attitude towards life। সমালোচকদের মতে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের দেশে যে সব নতুন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তার প্রধানতম হল উপন্যাস। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে ইংরেজি উপন্যাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সূত্রেই বাংলা উপন্যাসের যাত্রা শুরু। আর সেই সূচনাপর্বের ঋত্বিক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তার আগে উপন্যাসের আংশিক লক্ষণ ছিল সমকালের সমাজকেন্দ্রিক কিছু ব্যঙ্গচিত্রে। সে ছিল প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকানোর ইতিবৃত্ত। আসলে আধুনিক যুগের সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে উপন্যাসের সম্পর্ক একেবারে অন্তরঙ্গ। আখ্যানের অভাব এই সমাজে ছিল না। তবে একথা বললে ভুল হবে না যে বাংলা সাহিত্যে আখ্যান থেকে উপন্যাস হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি উনিশ শতকেই অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল। আসলে উনিশ শতকের কলকাতার বুকেই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের হাতে গড়ে উঠছিল নতুন ধরনের সাহিত্য। ইতিহাসের দিকে ফিরে দেখলে সার্থক উপন্যাসের আগের পর্যায়ে যেসব খণ্ড খণ্ড রচনায় উপন্যাসের বীজ নিহিত ছিল তাদের মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ) 'নববাবু বিলাস', 'নব বিবি বিলাস' ইত্যাদির সন্ধান মেলে। 'নববাবু বিলাস' এর পটভূমি উনিশ শতকের প্রথমার্ধ। এখানে অর্থ-মদমত্ত হঠাৎ-বাবু সম্প্রদায়ের এক বিলাসী নষ্টচরিত্র যুবকের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের নৈতিক গ্লানির চিত্র আঁকা হয়েছে। 'নব বিবি বিলাস' এরই পরিপূরক বলা চলে। এরপর প্যারীচাঁদ মিত্র আসেন (১৮১৪-১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ) নিয়ে। এর মধ্যে অনেকাংশে উপন্যাসের লক্ষণের সন্ধান মেলে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও 'আলালের ঘরের দুলাল' ভিন্নস্বাদ এনে দিয়েছিল। অবশ্য আলালের আগেই হানা ক্যাথরিন মলেন্স এর লেখা 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ)ও প্রায় উপন্যাস। এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে দেশীয় খ্রিস্টান সমাজের ক্রম-অভ্যুদয়ের আদর্শে-বাস্তবে মেশানো সামাজিক পরিস্থিতি। এরপর হুতোম প্যাঁচা ছদ্মনামে কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ) রচনা করেছিলেন 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' (১৮৬১-৬২ খ্রিস্টাব্দ)। আঙ্গিক আর ভাষারীতি দু-দিক থেকেই এর গুরুত্ব আছে। আদ্যন্ত চলিত বাংলায় লেখা এই নক্সাখানি সমকালের কলকাতার এক ঐতিহাসিক দলিল। এগুলি সবই ছিল উপন্যাসের পূর্বসূরি। এরপর ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ) শিরোনামে এক গ্রন্থে দুটি কাহিনি বিন্যস্ত করেছিলেন। তাদের মধ্যে একটি হল 'সফল স্বপ্ন', অন্যটি 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'তে

উপন্যাসের সম্পূর্ণ ছাঁচ আছে। ভারতীয় ইতিহাসের অতীত প্রেক্ষাপটে জীবন-দ্বন্দ্বের সমস্যা এখানে রূপায়িত। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মধ্যেই সার্থক ঔপন্যাসিকের পূর্ব-সম্ভাবনা অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল। এরপর মধুসূদন মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'সুশীলার উপাখ্যান' (১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ), যা হিন্দু নারীদের প্রতি নৈতিক উপদেশ বাক্যের উদ্দেশ্যমূলকতায় পর্যবসিত। রেভারেন্ড লালবিহারী দে খ্রিস্টধর্ম প্রচারকল্পে লিখেছিলেন 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' (১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ)।

এরপর বাংলা উপন্যাস ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন যথার্থ বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর প্রথম রচনাটি ইংরেজিতে লেখা, নাম 'Rajmohan's Wife'। বঙ্কিমচন্দ্র আগামীতে যা হয়ে উঠবেন তার প্রস্তুতিপর্ব বলা যেতে পারে একে। তাঁর চেতনার গভীরে তখন থেকেই প্রকৃত উপন্যাসের জনক হবার বীজ প্রোথিত হয়েছিল। তারপর তিনি বাংলায় উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য :

> 'তিনি গল্পসাহিত্যের এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিলেন। বিজয়বসন্ত বা গোলেবকাওলির যে চেহারা ছিল সে চেহারা আর রইল না।...বঙ্কিমচন্দ্রও কথাসাহিত্যের রূপের আদর্শ পাশ্চাত্য লেখকদের কাছ থেকে নিয়েছেন। কিন্তু...অনুকরণ করেছিলেন বললে জিনিসটাকে সংকীর্ণ করে বলা হয়।...সেকালের পাশ্চাত্য সাহিত্যিক স্কট বা বুলোয়ার লিটনের কাছ থেকে বঙ্কিম যদি ধার করে থাকেন সেটাতে আশ্চর্যের কথা কিছু নেই। আশ্চর্য এই যে, বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তার থেকে তিনি ফসল ফলিয়ে তুলতেন। অর্থাৎ তাঁর হাতে সেটা মরা বীজের মতো শুকনো হয়ে ব্যর্থ হল না। কথাসাহিত্যের নতুন রূপ প্রবর্তন করলেন; তাকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের পাঠকদের পরমানন্দ দিলেন।'[১০৬]

বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব যেন কিছুটা অপ্রত্যাশিত। রমেশচন্দ্র দত্ত সেকালের বাঙালি পাঠকের সেই বিস্ময়কে তুলে ধরেছেন :

> 'We all remember how, about ten or twelve years ago, the Bengali reading community was taken by surprise by the Durges Nandini, the first work of the author, and a master-work of creative imagination. It seemed as if a grand panorama had suddenly burst upon the reader's eyes; and if

> the mighty picture had any fault it was that the tints were too glowing, too dazzling, too bewildering.'[১০৭]

'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। এরপর একে একে বহু বিচিত্র সৃষ্টির অভিমুখ খুলে যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন ভাবে করেছেন। প্রখ্যাত সমালোচক সুকুমার সেন এই প্রসঙ্গে বলেছেন :

> 'বিষয়বস্তুর প্রকৃতি আর রোমান্স-রসের পরিমাণ অনুসারে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-গল্পগুলিকে তিনভাগে ফেলা যায়। এক, রসপ্রধান ও বিশুদ্ধ রোমান্টিক। যেমন দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা মৃণালিনী ইন্দিরা যুগলাঙ্গুরীয় রাধারানী ও রাজসিংহ। এগুলিতে নায়ক-নায়িকার প্রেম নির্দ্বন্দ্ব। কাহিনী জমিয়া উঠিয়াছে মিলনের বাহ্যিক বাধায়, ঘটনার ফেরে ও অদৃষ্টের চক্রান্তে। দুই, নীতিপ্রধান ও গার্হস্থ্য রোমান্স। যেমন বিষবৃক্ষ কৃষ্ণকান্তের উইল চন্দ্রশেখর এবং রজনী। নায়ক-নায়িকার প্রণয়দ্বৈধঘটিত অন্তর্দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসগুলির বৈশিষ্ট্য। তিন, নীতিপ্রধান ও "গীতোক্ত" অধ্যাত্ম-রোমান্স। যেমন আনন্দমঠ দেবী-চৌধুরানী এবং সীতারাম। দেশানুরাগ ও লোকহিত এই তিনটি উপন্যাসের মর্মকথা। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসের নীতি-আদর্শ সামাজিক, তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসের নীতি-আদর্শ রাষ্ট্রিক ও আধ্যাত্মিক।'[১০৮]

একথা যথার্থ যে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সের রসভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম দিকের সৃষ্টিগুলিতে ছিল রোমান্সের জোয়ার। প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে তার তেমন সংযোগ ছিল না। 'বিষবৃক্ষ' থেকে কাহিনি উপস্থিত হল আমাদের অভিজ্ঞতার বলয়ে। সমকালীন জীবন-প্রচ্ছদকে অবলম্বন করেই এই কাহিনি নির্মিত হয়েছিল। মোহের প্রাবল্য এবং সংযমের অভাব যে সংসারে বিপর্যয় আনতে পারে তা বঙ্কিম বেশ স্পষ্ট করেই বলেছিলেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনি সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণটিই ব্যবহার করেছিলেন। তিনি জানতেন তখনো পর্যন্ত আমাদের সমাজে ব্যক্তি শত সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ, তথাপি উপন্যাসের দাবিতেই ব্যক্তিস্বাধীনতা আর প্রেমে আত্ম-অধিকারের প্রয়োজন ছিল। এটা বঙ্কিমচন্দ্রকেও স্বীকার করতে হয়েছিল, ফলস্বরূপ তিনি তাঁর উপন্যাসের মূল চরিত্রদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্পর্কের বন্ধন থেকে বহুলাংশে মুক্ত করে দেখিয়েছেন। একথা মনে রাখতে হবে বঙ্কিমোত্তর কালে

নান্দনিকতাভিলাষী পাঠকের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি কেবল বিশুদ্ধ শিল্প হিসেবেই বিচার্য হলেও বঙ্কিমের পক্ষে শিল্পের পুষ্টিবিধানের সঙ্গে সঙ্গে জীবন-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও একান্তভাবে যুক্ত হয়েছিল। তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁকে নীতিবাগীশ মনে হলেও কাল এবং পরিস্থিতির বিচারেই তাঁর মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। সমকাল অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের এই নবীন রীতির নব সৃষ্টিকে বিনা বাধায় বরণ করে নেয়নি, বরং অনেক বিরূপ সমালোচনার মুখে তাঁকে পড়তে হয়েছিল। বঙ্কিমের উপন্যাসে আদর্শ চরিত্র নেই, বা জাতীয় জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে তার যোগ নেই--এ জাতীয় অভিযোগ সেই শতাব্দীর শেষভাগে বারে বারে উত্থাপিত হয়েছে। যেমন নবীনচন্দ্র সেন দাবি করেছেন :

> 'বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলিন ইউরোপীয় উপন্যাস হিসাবে উৎকৃষ্ট উপন্যাস। ভারতীয় সাহিত্যের হিসাবে উৎকৃষ্ট সাহিত্য নহে।'[১০৯]

তবে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে বঙ্কিমচন্দ্রের আগে কেউ প্রকৃত উপন্যাস রচনায় সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। সেদিক থেকে তাঁর সামনে পাশ্চাত্যের উপন্যাস ব্যতীত আর কোনো আদর্শ ছিল না। কাজেই উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে যদি পাশ্চাত্যের নভেলের ছায়াপাত ঘটেও থাকে তবে তা অগৌরবের নয়।

এরপরে বাংলা উপন্যাসের ধারায় রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮-১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ) নামোল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বঙ্কিমের অনুসরণেই বাংলা উপন্যাস-ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন। 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ), 'মাধবীকঙ্কণ' (১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ), 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ), 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' (১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস। আর 'সংসার' (১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ) এবং 'সমাজ' (১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর দুটি সামাজিক উপন্যাস। এখানে লেখকের সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য উচ্চারিত হয়েছে। এরপরে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ) 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ), শিবনাথ শাস্ত্রী 'মেজ বউ' (১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ), 'যুগান্তর' (১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ), 'নয়নতারা' (১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ), স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫-১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ) 'স্নেহলতা' (১২৯৯ বঙ্গাব্দ) ইত্যাদি সামাজিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এছাড়া পল্লী বাংলার জীবন চিত্রকে 'শক্তি-কানন' (১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ), 'ফুলজানি' (১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি উপন্যাসে মূর্ত করে তুলেছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ)। আর ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারায় ক্রমশ এসেছিল স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ), 'মিবাররাজ' (১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ), 'বিদ্রোহ' (১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ), 'ফুলের মালা' (১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ), প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (দুইখণ্ড ১৮৬৯, ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ), হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৮৫২-১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) 'কাঞ্চনমালা' (১৯১৬), 'বেনের মেয়ে' (১৯২০) ইত্যাদি। উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন :

> 'উনিশ শতকের বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে প্রধান কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। তার মধ্যে প্রধান হল রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীরত্বের সঙ্গে পাঠান-মোগলদের বিরোধের কাহিনি। দ্বিতীয় একটি ধারায় প্রাধান্য পেয়েছে দেশাত্মবোধকে হিন্দু ধর্মের তথা হিন্দুত্ববাদের পুনরুত্থানের সঙ্গে একাত্ম করবার প্রবণতা। আর্যজাতি সম্পর্কিত গৌরববোধ থেকে এসেছিল হিন্দুত্ব-গৌরব চেতনা। এদিক থেকেও উনিশ শতকীয় বাঙালি হিন্দুর স্বাদেশিকতার বৃত্ত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল মুসলমান সম্প্রদায়...এই হিন্দুত্ববাদ প্রত্যক্ষত যতটা মুসলমান-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিল, ততটা খ্রিস্টান বা ব্রিটিশ-বিরোধী বলে প্রতিভাত হয়নি।'[১১০]

এছাড়া সিপাহি বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছিল বেশ কিছ উপন্যাস, যেমন চণ্ডীচরণ সেনের 'ঝান্সীর রাণী' (১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ), কালীপ্রসন্ন দত্তের 'বিজয়' (১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ), প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'তান্তিয়া ভিল' (১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি। এছাড়া ভিন্নমাত্রিক উপন্যাস লক্ষণ নিয়ে আবির্ভাব ঘটে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'অভেদী' (১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদির। অন্যদিকে অতিপ্রাকৃত বিষয়ের মোড়কে সমাজ সমালোচনার উদ্দেশ্য নিয়ে লিখিত হয় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ) 'কঙ্কাবতী' (১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর রচনায় রূপকথাধর্মী অসম্ভবের রস অফুরন্ত ধারায় বয়ে গেছে। জীবনের রসাবেদনকে লঘু না করেও যে কৌতুকমণ্ডিত করা চলে, ত্রৈলোক্যনাথের রচনা তার অদ্বিতীয় নিদর্শন।

উনিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে দুজন উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমী স্রষ্টা হলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১ খ্রিস্টাব্দ) এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪-১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ)। ইন্দ্রনাথের বিশেষত্ব হাস্যরসাত্মক নক্সা জাতীয় রচনায়। সমালোচক সুকুমার সেন এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন :

> 'গদ্যে পদ্যে ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গরচনা তখনকার পাঠক-সমাজে এক নূতন মত্ততার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইঁহার 'কল্পতরু' (১২৮১) বাঙ্গালায় প্রথম ব্যঙ্গ-উপন্যাস।'[১১১]

মূলত স্যাটায়ারকে বঙ্গ জীবনের উপভোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যেই তিনি কলম তুলে নিয়েছিলেন। আর 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্রও ব্যঙ্গ কাহিনি রচনায় হাত পাকিয়েছিলেন পাঠককে ভিন্ন রসের জোগান দেওয়ার জন্য। কিছুটা রক্ষণশীল

মানসিকতার যোগেন্দ্রচন্দ্রের বিখ্যাত 'মডেল ভগিনী' (চার ভাগ, ১৮৮৬-৯১ খ্রিস্টাব্দ) আঙ্গিক আর অন্তর্বস্তু দুদিক থেকেই সুস্বাদু এবং সমুত্তীর্ণ রচনা।

আসলে বঙ্কিম-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত। কিন্তু প্রত্যেকের রচনাই কালোত্তীর্ণ হতে পারেনি। তাই এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কিছু নামই আলোচিত হল। তবে একটা বিষয় এখানে অবশ্যই ভেবে দেখার যে এতক্ষণের আলোচনায় আমরা প্রায় কোনো মুসলিম সাহিত্যিকের নাম পাইনি যিনি বাংলা সাহিত্যে নতুন দিগন্তের পথিক উপন্যাস রচনায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম লেখকের হাতে সৃষ্ট উপন্যাসের দৃষ্টান্ত তেমন চোখে পড়ে না। এর মূলেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক চক্রান্ত আছে। বাংলাদেশে পলাশির যুদ্ধের পরে ইংরেজ অধিকার যত বিস্তৃত হয়েছে ততই মুসলিমদের চিত্তে ইংরেজদের প্রতি বিমুখতা আর অবিশ্বাসের চারা ডালপালা মেলেছে। তারা ইংরেজদের যাবতীয় বিষয় থেকে দূরত্ব বজায় রাখাকেই শ্রেয় মনে করেছে, অন্যদিকে হিন্দুরা এই সব সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দ্বিধা করেনি। ফলে হিন্দুরা যত শাসকের অনুগ্রহভাজন হওয়ার দিকে এগিয়েছে ততই হিন্দু-মুসলিম বিভেদের রেখাটিও চওড়া হয়েছে। নিজেদের মাতৃভাষা নিয়েও দ্বিধা ছিল বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে। এই পরিস্থিতিতেই নতুন প্রত্যাশার তরঙ্গ উঠেছিল মীর মশার্‌রফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১১ খ্রিস্টাব্দ) হাত ধরে। তাঁর 'রত্নাবতী' (১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ) আধুনিক মুসলমান সাহিত্যিকের রচিত প্রথম উপন্যাসধর্মী রচনা। এরপর তিনি রচনা করেন 'বিষাদসিন্ধু' ঐস্লামিক ধর্মকথার এক মহাকাব্যিক গদ্যরূপ। এছাড়া 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' তাঁর আত্মজীবনীমূলক গদ্য রচনা। অতএব উনিশ শতকে মুসলমান সাহিত্যিকদের হাতে প্রকৃত উপন্যাস রচিত হতে পারেনি। তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল বিশ শতক পর্যন্ত। কিন্তু এটুকু বাদ দিয়ে বিচার করলে উনিশ শতকে বাংলা উপন্যাসের নানাবিধ রূপবৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে। নানা আদর্শের সঙ্গে গল্পরসের মিশ্রণে এসব উপন্যাস পাঠকের মনোরঞ্জনে সক্ষমও হয়। দিগন্তবিস্তারী কল্পনার ছোঁয়ায় উদ্দীপ্ত হয়ে, মনীষার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে সে অভূতপূর্ব পুষ্পে পত্রে পল্লবিত হয়ে উঠতে থাকে। যে সময়ের গর্ভে তার জন্ম, সেই সময়ই তার ক্রমাগত নির্মিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পুষ্ট করে তুলতে থাকে। আর উনিশ শতকে উপন্যাসের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি হয় তাই শতাব্দী অতিক্রম করে উপযুক্ত প্রতিভার স্পর্শে এই ধারাটিকে সতেজ আর সজীব করে রাখে।

চ তু র্থ প রি চ্ছে দ

নবযুগ পরিণাম : আকাঙ্ক্ষা ও নিষ্কৃতি

এতক্ষণের আলোচনা থেকে এটুকু স্পষ্ট যে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে আসা বিদেশি মানুষদের সংস্পর্শে এসে, তাদের শিক্ষা-সভ্যতা, তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সূত্রে এদেশের নব্যশিক্ষিত মানুষের সামনে এক নতুন পৃথিবীর দরজা খুলে গিয়েছিল, সন্দেহ নেই। নতুন দিগন্ত স্পর্শ করতে পারার আকাঙ্ক্ষায় তারা সানন্দে তাকে বরণও করেছিল। দীর্ঘদিনের গতানুগতিকতার ক্লান্তিকর পুনরাবর্তন থেকে মুক্তি এনে দিয়েছিল সেই নতুন জগতের নতুন নতুন বিষয়। সমকালের পরিস্থিতিতে প্রায় সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের কাছেই ব্রিটিশ শাসন ছিল বিধাতার আশীর্বাদের মত। যেহেতু যবনেরা এই দেশকে অধিকার করে বহুকাল শাসন-শোষণ চালিয়েছে বলে হিন্দুদের আত্মাভিমান আহত হয়েই ছিল, সেখানে ব্রিটিশদের হাত ধরে সেই শৃঙ্খল মোচন হয়েছে ভেবে আনন্দিত হয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের ভাবনা অনুসারে ব্রিটিশ শাসন এনে দিয়েছিল অরাজক মুসলিম শাসনের হাত থেকে মুক্তি, এনে দিয়েছিল জীবন ও জীবিকায় স্বাধীন আর লাভবান হওয়ার সুযোগ, বর্ণ আর বংশানুক্রমিক বৃত্তির দাসত্ব থেকে নিষ্ক্রমণের সুযোগ, এনে দিয়েছিল ইন্দ্রিয়-সংবেদ্য জীবনের আস্বাদ। আগে বংশ আর রক্তসম্পর্কের অত্যন্ত ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু নতুন নগরে সেই সামাজিক অচলায়তন ভেঙে গিয়েছিল। নতুন ভাবনার বীজ ক্রমশ ডালপালা বিস্তার করতে শুরু করেছিল। আর এই সব কিছুই ঘটছিল নতুন নগর কলকাতার নবজাগৃতির বলয়ের মধ্যে। সবদিক থেকে কলকাতার গুরুত্ব বৃদ্ধি হচ্ছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবে সেখানকার আলোকপ্রাপ্তরাই পাচ্ছিল অগ্রগামী ইউরোপীয় চিন্তার অধিকার। ফলে বাংলার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রবিন্দুর বিচলন হয়ে উঠেছিল অবশ্যম্ভাবী। মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ বা কৃষ্ণনগরের ঔজ্জ্বল্য ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছিল শাসকের নবপ্রতিষ্ঠিত নগর কলকাতা ও তার নব্য নাগরিকদের কাছে। কলকাতার সঙ্গে এদের স্থানিক দূরত্ব যাই হোক না কেন, যুগের দূরত্ব হয়ে উঠছিল দুস্তর। সময় এবং পরিস্থিতির দাবিতে পূর্বসূরিদের নাগরিকতার সংজ্ঞার সঙ্গে এদের নবনির্মিত নাগরিকতার সংজ্ঞার পার্থক্য তৈরি হচ্ছিল ক্রমশ। তাদের রুচি, মনন ও চিন্তনে বদল আসছিল দ্রুত, উনিশ শতকের নাগরিকের হাত ধরে উন্মুক্ত হয়ে উঠছিল উনিশ শতকের এক নতুন সাহিত্যিক দিগন্ত। মূলধারার সাহিত্যে সে এক মহামুহূর্ত বললে অত্যুক্তি হয় না। অজস্র শাখায়, নানা রূপে তার বিকাশ এবং বিস্তার ঘটতে থাকে।

তবে এই মূলধারার সাহিত্যের বিকাশ-বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয়। সেটা এই যে, মূলধারার সাহিত্য শাসন-কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে রূপান্তরিত হয়েছিল। প্রশাসনিক কাঠামো বদলের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ধারাপথেও একটা বিবর্তন ঘটে গেল। অতীতের মূলধারার যে সাহিত্যশাখাগুলি ছিল রাজপুরুষ, অভিজাত বা বিদগ্ধের আস্বাদনের বস্তু, তা নব্য নাগরিকের পরিশীলিত চেতনায় আর ততখানি আলোড়ন জাগাতে পারল না। পাশ্চাত্য ভাবনায় অনুপ্রাণিত সামাজিক গতির তরঙ্গে ধৌত হয়ে তার ঔজ্জ্বল্য ফিকে হতে শুরু করল ক্রমশ। আর তার পাশে নতুন উদ্যমে জেগে উঠতে লাগল এক তথাকথিত শিষ্ট নাগরিক সাহিত্যধারা যা পাশ্চাত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং প্রভাবিত। নাগরিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। মান্যতার নতুন শর্ত মেনে সেও রূপান্তরিত হল। আধুনিক যুগের উদয়পর্বে এভাবেই মান্য তথা নাগরিক সংস্কৃতি চিরকালের মতই প্রভুশক্তির তালে তাল রেখে নিজের বিবর্তন ঘটাল। সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে নানা শাখা-প্রশাখায় সৃষ্ট ও আস্বাদিত হতে লাগল সাহিত্যের এই মূলধারার নতুন ফসল।

উল্লেখপঞ্জি

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান,* অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১৩, কলকাতা, পৃ ১৫

২. Schucking, Levin Ludwig, *The Sociology of Literary Taste,* Routledge, Trench, Trubner and Co.,Ltd, England, 1944, p. 9

৩. চৌধুরী, প্রমথ, *বই পড়া,* সুমিতা চক্রবর্তী সম্পাদিত *প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ সংগ্রহ,* প্রজ্ঞা বিকাশ, প্রথম প্রজ্ঞা বিকাশ সংস্করণ, ৭ আগস্ট ২০১৩, কলকাতা, পৃ ১৮১

৪. ওই, পৃ ১৮১

৫. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিমার্জিত অষ্টম সংস্করণ, আষাঢ় ১৪২২, পৃ ৩১০-১৩

৬. তথ্যটি গৃহীত হয়েছে দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *রাজসভার কবি ও কাব্য,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় সংশোধিত (ব.সা.স) সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৮, কলকাতা, পৃ ১ থেকে।

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, *রাজসভার কবি ও কাব্য,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় সংশোধিত (ব.সা.স) সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৮, কলকাতা, পৃ ২

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বাংলা সাহিত্যের কথা।* এখানে তথ্যটি গৃহীত হয়েছে দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *রাজসভার কবি ও কাব্য* গ্রন্থের পৃ ৭৬ থেকে।

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, ওই, পৃ ৫-৬

১০. রায়, ভারতচন্দ্র, *অন্নদামঙ্গল (গ্রন্থসূচনা অংশ),* জয়িতা দত্ত সম্পাদিত *ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল,* রত্নাবলী, প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ আশ্বিন ১৪১৭/ সেপ্টেম্বর ২০১০, কলকাতা, পৃ ৪১

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, পৃ ৩৪

১২. ওই, পৃ ২০

১৩. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সম্মার্জিত নূতন সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ জুলাই ২০০৫, আষাঢ় ১৪১২, পৃ ৭৯

১৪. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৩ শ্রাবণ, আগস্ট ২০০৬, পৃ ৭। মূল তথ্যের জন্যে দ্রষ্টব্য *History of Bengal Vol. ll, Ch. Vll.*

১৫. ওই, পৃ ৭

১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, ওই, পৃ ৪৪। মূল তথ্যটি সুখময় মুখোপাধ্যায়ের *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর* গ্রন্থের অন্তর্গত।

১৭. ওঝা, কৃত্তিবাস, *শ্রীরাম পাঁচালি,* ভূদেব চৌধুরী রচিত *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সম্মার্জিত নূতন সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ জুলাই ২০০৫, আষাঢ় ১৪১২, পৃ ১০১

১৮. বসু, মালাধর, *শ্রীকৃষ্ণবিজয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সম্মার্জিত নূতন সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ জুলাই ২০০৫, আষাঢ় ১৪১২, পৃ ১১৩

১৯. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ ২০৮

২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, *রাজসভার কবি ও কাব্য,* পৃ ১৮৩

২১. সেন, দীনেশচন্দ্র, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ১৯৮৬, কলকাতা, পৃ ১২৯

২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, পৃ ৫৯

২৩. ওই, পৃ ৬০

২৪. গোস্বামী কবিরাজ, কৃষ্ণদাস, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত,* (সম্পাদনা শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার), আদিলীলা, ১৭ পরিচ্ছেদ, পি, সি, মজুমদার এন্ড ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৪১, পৃ ১২২-১২৩

২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান,* অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১৩, কলকাতা, পৃ ১৬-১৭

২৬. দাস, বৃন্দাবন, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, পঞ্চদশ অধ্যায়,* সাহিত্যসঙ্গী, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২, পৃ ৯২

২৭. গোস্বামীকবিরাজ, কৃষ্ণদাস, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত,* (সম্পাদনা শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার), *আদিলীলা, ১৭ পরিচ্ছেদ,* পৃ ১২৫। গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা এবং মুসলিম শাসক উভয়েই এই নগর-সংকীর্তনের বিপক্ষে ছিল। এতে নিম্নশ্রেণির মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ রক্ষণশীল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আশঙ্কান্বিত করে তুলেছিল। তাই নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে তারা এই সতর্কবার্তার আশ্রয় নিয়েছিল যে নিম্নজাতির মানুষের কৃষ্ণনাম উচ্চারণের এই পাপে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যাবে।

২৮. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়),* পৃ ৩৫৬

২৯. সেন, সুকুমার, *বাংলার সাহিত্য-ইতিহাস,* সাহিত্য অকাদেমি, নবম মুদ্রণ ২০১৫, পৃ ৯৪

৩০. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়)* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৩ শ্রাবণ, আগস্ট ২০০৬, পৃ ৮, মূল তথ্যের জন্যে দ্রষ্টব্য *History of Bengal Vol. ll, Ch. Xll.*

৩১. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সম্মার্জিত নূতন সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ জুলাই ২০০৫, আষাঢ় ১৪১২, পৃ ৩৫৪। মূল তথ্যটি ড. তপনকুমার রায়চৌধুরীর গ্রন্থের অন্তর্গত।

৩২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *কালান্তর,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, নূতন সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৪১৭, পৃ ১২

৩৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান,* অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১৩, কলকাতা, পৃ ১৭

৩৪. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়),* পৃ ১১

৩৫. চৌধুরী, তপন, *Bengal Under Akbar and Jahangir,* তথ্যটি গৃহীত ভূদেব চৌধুরীর *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়),* পৃ ১১ থেকে।

৩৬. সেন, সুকুমার, *বাংলার সাহিত্য-ইতিহাস,* সাহিত্য, নবম মুদ্রণ, ২০১৫, পৃ ১১৪

৩৭. সেন, সুকুমার, ওই, পৃ ১১৮

৩৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *আধুনিক কাব্য, সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড,* বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২২, পৃ ৪৬৩

৩৯. শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* (সম্পা) বারিদবরণ ঘোষ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, দ্বিতীয় সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, কলকাতা, পৃ ৬৩

৪০. গুপ্ত, সুশীল কুমার, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ,* এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৮৩, কলকাতা, পৃ ১৪১

৪১. বসু, স্বপন, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, অগাস্ট ২০১৬, পৃ ২০৪

৪২. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ, ১৪১৩ শ্রাবণ, আগস্ট ২০০৬, পৃ ৪৫

৪৩. দাস, সজনীকান্ত, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড।* তথ্যটি সংগৃহীত ভূদেব চৌধুরীর *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়),* পৃ ৪৬

৪৪. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড,* আনন্দ পাবলিশার্স, দশম মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২১, কলকাতা, পৃ ১

৪৫. শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* (সম্পা) বারিদবরণ ঘোষ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, দ্বিতীয় সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, কলকাতা, পৃ ৪৯

৪৬. ন্যায়রত্ন, রামগতি, *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব,* সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, নূতন সংস্করণ, ১৯৯১, পৃ ১৬৮

৪৭. Nair, P. Thankappan (ed.), *Calcutta In the 19th century,* Firma KLM Private Limited, Calcutta, India, p 23

৪৮. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়),* পৃ ৯০

৪৯. ওই, পৃ ৯০

৫০. ওই, পৃ ৯৫

৫১. সেন, সুকুমার, আধুনিক সাহিত্যের উপক্রম, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, দশম মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২১, কলকাতা, পৃ ২৫

৫২. ওই, পৃ ২৫

৫৩. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়),* পৃ ১০০

৫৪. William, Monier, *Religious Thought and Life in India, Part l,* London 1883, p. 492। তথ্যটি গৃহীত সুশীল কুমার গুপ্তের *ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ,* পৃ ১৫২

৫৫. সেন, সুকুমার, *বাংলা সাহিত্যে গদ্য,* আমি তথ্যটির জন্য ঋণী চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়),* পৃ ১০৫ কাছে।

৫৬. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়),* পৃ ১০৭

৫৭. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড,* পৃ ১৮

৫৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চারিত্রপূজা, রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড,* বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, আশ্বিন ১৪২২, পৃ ৭৬৭

৫৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্যসাধক চরিতমালা।* তথ্যটি গৃহীত ভূদেব চৌধুরীর *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়),* পৃ ১২৬

৬০. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড,* পৃ ৩৪

৬১. ন্যায়রত্ন, রামগতি, *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব,* সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, নূতন সংস্করণ, ১৯৯১, পৃ ২১০

৬২. বসু, রাজনারায়ণ, *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা,* গ্রন্থন, গ্রন্থন সংস্করণ জুলাই ১৯৭৩ খ্রিঃ, পৃ ৪৫

৬৩. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২৮

৬৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, সাধারণ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৪১৭, পৃ ১৩৭

৬৫. মুখোপাধ্যায়, ভূদেব, *সামাজিক প্রবন্ধ,* তথ্যটি সংগৃহীত *উনিশ শতক* (রচয়িতা অলোক রায়), প্রমা প্রকাশনী, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১২, কলকাতা, পৃ ১৬৯

৬৬. ওই, পৃ ১৭২

৬৭. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৫৭

৬৮. Dae Ar Cy [Romesh Chunder Dutt], *The Literature of Bengal,* Calcutta, 1877, তথ্যটি সংগৃহীত ভূদেব চৌধুরীর *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়),* পৃ ১৪৩

৬৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, *পদ্মিনী উপাখ্যান।* সংগৃহীত ভূদেব চৌধুরীর *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়),* পৃ ২০১

৭০. ন্যায়রত্ন, রামগতি, *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব,* সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, নূতন সংস্করণ, ১৯৯১, পৃ ২৩৭

৭১. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়),* পৃ ২০৬

৭২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সাহিত্যরূপ, সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড,* বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২২, পৃ ৫১১

৭৩. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড,* পৃ ৭২

৭৪. তথ্যটি সংগৃহীত হয়েছে ভূদেব চৌধুরীর *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়),* পৃ ২১০ থেকে।

৭৫. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড,* পৃ ৭৪

৭৬. তথ্যটি সংগৃহীত হয়েছে *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়),* পৃ ২২৩ থেকে।

৭৭. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, *মেঘনাদবধ কাব্য, প্রথম সর্গ* (ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ড. মিলন দত্ত সম্পাদিত), সাহিত্যম্, পৃ ২

৭৮. তথ্যটি সংগৃহীত হয়েছে ভূদেব চৌধুরীর *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়),* পৃ ২২৪ থেকে।

৭৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সাহিত্যসৃষ্টি, সাহিত্য,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, কার্ত্তিক ১৪১১, পৃ ১১০

৮০. ন্যায়রত্ন, রামগতি, *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব,* সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, নূতন সংস্করণ, ১৯৯১, পৃ ২১৯

৮১. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড,* পৃ ৭৫

৮২. ওই, পৃ ৮৬

৮৩. ওই, পৃ ৮৮

৮৪. Dasgupta, Harendra Mohan, *Studies In Western Influence On Nineteenth Century Bengali Poetry 1857-1887,* Chuckervertty, Chatterjee & co. Ltd, Kolkata, 1935, p 51

৮৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র, *বৃত্রসংহার, চতুর্দশ সর্গ,* (শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ১ম খণ্ড ও ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে ২য় খণ্ড প্রথম প্রকাশিত, পৃ ১৪৪-১৪৫

৮৬. Dasgupta, Harendra Mohan, *Studies In Western Influence On Nineteenth Century Bengali Poetry 1857-1887,* p 51-52

৮৭. দাস, সজনীকান্ত, ভূমিকা, *বৃত্রসংহার,* সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ

৮৮. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* তৃতীয় খন্ড, পৃ ২৭৮

৮৯. তথ্যটি সংগৃহীত অলোক রায়ের *উনিশ শতক* গ্রন্থের *হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান : বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র প্রবন্ধ,* পৃ ২২৬

৯০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, সাধারণ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৪১৭, পৃ ৭৮-৭৯

৯১. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়),* পৃ ২৬৫

৯২. গুপ্ত, বিপিনবিহারী, *পুরাতন প্রসঙ্গ,* পুস্তক বিপণি, প্রথম সংস্করণ, অগস্ট ১৯৮৯, পৃ ৩৯

৯৩. তথ্যটি সংগৃহীত হয়েছে সুকুমার সেনের *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড,* পৃ ২৬৩ থেকে।

৯৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *বিহারীলাল, আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড,* ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, পৃ ৫৩৯

৯৫. ন্যায়রত্ন, রামগতি, *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব,* সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, নূতন সংস্করণ, ১৯৯১, পৃ ২৯৫

৯৬. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড,* পৃ ৯১

৯৭. সরকার, পবিত্র, *উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটক ও তার প্রয়োগকলা* লেখাটিতে এই তথ্যের উল্লেখ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন অধ্যাপক পুলিনবিহারী দাসের পরিসংখ্যানটি আছে বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক ১ম খণ্ডে। এই লেখাটির জন্য দ্রষ্টব্য *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি,* পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০৩, কলকাতা, পৃ ৫১৩

৯৮. সরকার, পবিত্র, *উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটক ও তার প্রয়োগকলা,* ওই, পৃ ৫১৩

৯৯. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড,* পৃ ৯৬

১০০. সরকার, পবিত্র, ওই, পৃ ৫১৫

১০১. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, শর্মিষ্ঠা নাটক, তথ্যটি গৃহীত চৌধুরী ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়),* পৃ ২৯৩ থেকে।

১০২. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড,* পৃ ১৩১

১০৩. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়),* পৃ ৪১১

১০৪. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড,* পৃ ৩১৮

১০৫. সরকার, পবিত্র, ওই, পৃ ৫২১

১০৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সাহিত্যরূপ, সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড,* পৃ ৫১২-৫১৩

১০৭. Dae Ar Cy [Romesh Chunder Dutt], *The Literature of Bengal,* Calcutta, 1877, p. 196

১০৮. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* তৃতীয় *খণ্ড,* পৃ ১৭৭

১০৯. সেন, নবীনচন্দ্র, *আমার জীবন, চতুর্থ ভাগ* (১৩১৮), *নবীনচন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড,* দত্তচৌধুরী অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ১৩৮২, পৃ ১২৮-২৯

১১০. চক্রবর্তী, সুমিতা, *আখ্যান থেকে উপন্যাস, উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি,* পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০৩, কলকাতা, পৃ ৫৪২

১১১. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড,* পৃ ৪৭২